বিজ্ঞানী নিউটন



শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

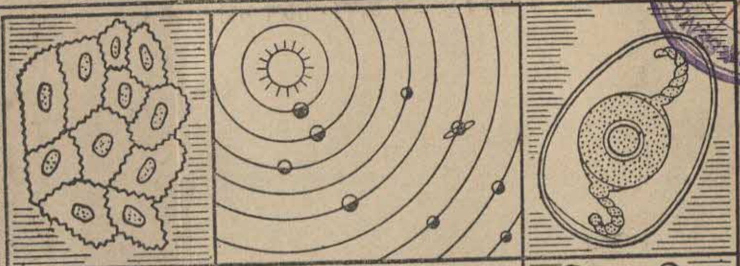
া-সাধক-চরিতমালা

ওরিয়েণ্ট
কাম্পানি

(অ্যাপ্লায়েড কেমিস্টি) এম. এস-সি. পাশ করেন। এই সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র হবার সৌভাগ্য হয়েছিল এঁর।

অতি অল্প বয়স থেকেই ইনি সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত এবং নানা সাময়িক পত্রে লিখতে সুরু করেন। গত ২০ বছর ধরে ছোটদের সুবিখ্যাত মাসিক পত্র 'রামধনু'র সম্পাদনা ক'রে আসছেন এবং ছোটদের জন্য কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও রচনা করেছেন। বাংলার শিশুসাহিত্যিকদের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান শিশুসাহিত্য-পরিষদের ইনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং বর্তমানে উক্ত পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।

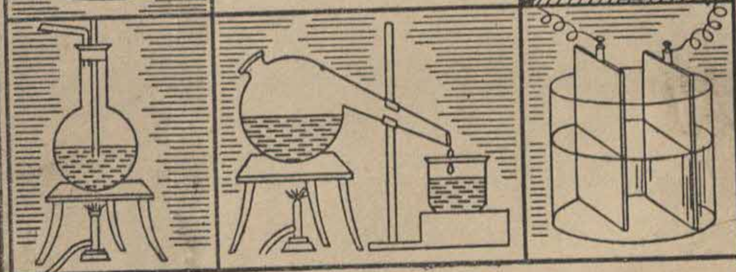
বিজ্ঞান-সাধক চরিতমালা : দুই





মহাবিজ্ঞানী নিউটন





শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য



ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি



॥ প্রথম প্রকাশ : ১লা অক্টোবর : ১৯৫৮
॥ দাম : এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

ই সময়ে আচার্য

য় অনুরক্ত এবং
ধরে ছোটদের
আসছেন এবং
ছন। বাংলার
রিষদের ইনি
-সভাপতি।

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধ
লিমিটেড, ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬



নিবেদন

কাছে রহস্য আর রোমাঞ্চকর কাহিনী চিরকালই প্রিয়। কাহিনী মন-গড়া না হয়ে সত্যিকার কাহিনীও তো হতে এই রকম অনেক কাহিনী আমাদের চোখের সামনেই াছে, আর তার সন্ধান দিয়েছে বিজ্ঞান। মন-গড়া গল্পের বিজ্ঞানের এই সব সত্যিকার গল্প কম কৌতূহলকর নয়। ানীকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের গল্প হয় না; আবিষ্কার আর কর কাহিনী তাই পাশাপাশি থাকা দরকার।

স্বভাবতঃই একটু জটিল। ছোটদের কাছে ঠিক তার রিবেশন করা চলে—ঠিক কতটুকু পর্যন্ত তারা বুঝে উপভোগ বে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। দুরূহ, দুষ্পাচ্য দের সামনে এনে লাভ নেই। এই জন্যই এ বই-এ, স্থান কান কোন আবিষ্কারের কথা মাত্রা না ছাড়িয়ে সংক্ষেপে ছে।

জ্ঞানী নিউটন পৃথিবীর সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের তাঁর কাহিনী দিয়েই এই গ্রন্থমালা সুরু করলাম। এর রে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কথাও লিখবার ইচ্ছে রইল।

শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের উৎসাহেই এই কাজে । কাজেই এ বই প্রকাশের নিন্দা বা যশের খানিকটা ।

টনসেণ্ড রোড,
লকাতা-২৫
আগস্ট, ১৯৫৮

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

স্নেহের

ঝর্ণা, অপর্ণা, দীপা, গোপা

ও

তপনকে

—ছোট দাদু

নিউটনের জীবনের ঘটনাপঞ্জী

জন্ম ও বংশ-পরিচয় ঃ জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর, ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে, ইংল্যাণ্ডের লিংকনশায়ার অঞ্চলে উল্‌স্থর্প গ্রামে এক সঙ্গতিপন্ন চাষীর ঘরে। পিতার নামও আইজাক্ নিউটন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই পিতাকে হারাতে হয়।

শৈশব ঃ ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মা হান্না পুনর্বার বিবাহ করেন বার্নাবাস্ স্মিথকে এবং নতুন স্বামীর সংসারে চলে যান। নিউটন মানুষ হতে থাকেন দিদিমার কাছে, গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে।

বিদ্যারম্ভ ও বাল্যজীবন ঃ লেখাপড়া স্থরু হয় প্রথমে স্কিলিংটন আর স্টোক্‌স-এর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর গ্র্যাণ্টহামের গ্রামার স্কুলে। গ্র্যাণ্টহামে মিঃ ক্লার্কের বাড়ীতে আশ্রয়-লাভ।

স্কুলে একদিন মারামারির পর স্বভাবের আকস্মিক পরিবর্তন —লেখাপড়ার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। মুখচোরা স্বভাব, কিন্তু হাতের কাজে অসামান্য প্রতিভা। জল-ঘড়ি, সূর্য-ঘড়ি, খেলনা হাওয়া-কল প্রভৃতি তৈরীর ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আভাস।

কৈশোরজীবন ও স্কুল-ত্যাগ ঃ মিঃ স্মিথের মৃত্যু (১৬৫৬ খৃঃ) হওয়ায় মা হান্নার উল্‌স্থর্পে প্রত্যাবর্তন। সংসারের খরচ চালাবার জন্য নিউটনকে স্কুল ছাড়িয়ে ক্ষেত-খামারের কাজে নিয়োগ। কিন্তু নিউটনের ঐ কাজে বিতৃষ্ণা। চাকরের ঘাড়ে গোপনে সব কাজ চাপিয়ে, পালিয়ে এসে মিঃ ক্লার্কের বাড়ীর চিলেকোঠায় বা স্পিট্‌লগেট পাহাড়ের নীচে লুকিয়ে বসে বই পড়ার ব্যবস্থা।

আবার ছাত্রজীবন ঃ নিউটনকে দিয়ে ক্ষেত-খামারের কাজ চলবে না

বুঝে আবার তাকে গ্র্যান্টহামের কিংস্ কলেজে ভর্তি করার ব্যবস্থা। ১৯ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ (১৬৬১)। ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিশেষ ক'রে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। অধ্যাপক ডাঃ ব্যারোর সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর অকৃত্রিম স্নেহলাভ। ২২ বছর বয়সে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (গ্র্যাজুয়েট) হলেন (১৬৬৪)।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু: কেম্ব্রিজে ও ইংল্যাণ্ডের নানা জায়গায় ভয়াবহ প্লেগের আবির্ভাব। ফলে উল্‌স্‌থর্প গ্রামে প্রত্যাবর্তন ও বিজ্ঞানসাধনায় আত্মনিয়োগ। নিউটনের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দু'টি বছর (১৬৬৪-৬৬)। পর পর কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূচনা—আলোকবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্রের নতুন রীতি ফ্লাক্‌সিয়ন্‌স্ (ডিফারেন্‌শিয়াল্ ক্যাল্‌কুলাস্), জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং সুবিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব।

কর্মজীবন আরম্ভ: প্লেগ কমলে কেম্ব্রিজে প্রত্যাবর্তন (১৬৬৭ খৃঃ)। ট্রিনিটি কলেজের ফেলো পদে নির্বাচিত—প্রথমে জুনিয়র ফেলোশিপ্, তার কয়েক মাস পরে সিনিয়র ফেলোশিপ্। ঐ বছরই এম্. এ. ডিগ্রী লাভ। ১৬৬৯ খৃঃ অধ্যাপক ব্যারো স্বেচ্ছায় লিউকেসিয়ান অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করলে ২৭ বছর বয়সে নিউটনের ঐ পদ লাভ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—একটার পর একটা,—বিশেষ ক'রে অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে। রিফ্লেক্‌টিভ টেলিস্কোপ (প্রতিফলনশীল দূরবীন) আবিষ্কার। রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ।

মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব: ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী পিকার্দের পৃথিবীর ব্যাস নির্ভুল ভাবে নির্ণয়। নিউটনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব প্রমাণিত।

আরও গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক কলহ : রসায়নশাস্ত্র ও ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ—ফ্রিক্‌শনাল্ ইলেক্‌ট্রিসিটি নিয়ে গবেষণা ও আবিষ্কার (১৭৭৬ খৃঃ)। জার্মান্ বিজ্ঞানী লাইব্‌নিৎস্‌এর সঙ্গে ডিফারেন্‌শিয়াল্ ক্যাল্‌কুলাস্‌এর আবিষ্কারকের গৌরব নিয়ে বিবাদ।

প্রিন্সিপিয়া রচনা : বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া' রচনা (১৬৮৫-৮৭ খৃঃ), কিন্তু প্রকাশে অনাগ্রহ। হ্যালির চেষ্টায় প্রিন্সিপিয়ার প্রকাশ ও বিজ্ঞান-জগতে হুলস্থূল। হুক্‌-এর দাবী ও নানা আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিয়ে নিউটনের সঙ্গে তর্ক, কলহ ও মনোমালিন্য। অবশেষে হুকের পরাজয়।

রাজনীতিতে : রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী দ্বিতীয় জেম্‌স্‌এর ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভ। প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজার বিরোধ। শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল প্রেরণ ও নিউটনের ঐ দলে স্থান লাভ। নিউটনের দৃঢ়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনমনীয়তা। দ্বিতীয় জেম্‌স্‌এর পলায়ন। প্রিন্স উইলিয়াম্ অব্ অরেঞ্জের ইংল্যাণ্ডের রাজপদ লাভ। প্রোটেস্ট্যান্ট দলের শক্তিবৃদ্ধি। নিউটনের পার্লামেণ্টে সদস্যপদ লাভ।

মানসিক রোগ : ১৬৯২ খৃঃ। পোষা কুকুরের জন্য ২০ বছরের গবেষণালব্ধ কাগজপত্র পুড়ে যাওয়ায় মানসিক হতাশা এবং তা থেকে মানসিক বিষাদরোগ। মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ। চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মান লাভ : লণ্ডনের টাঁকশালে বড়কর্তার (মাস্টার অব্ দি মিণ্ট) পদে নিয়োগ। আর্থিক সচ্ছলতা লাভ। লণ্ডনে স্থায়ী ভাবে বসবাস।

১৬৯৯ খৃঃ ফরাসী বিজ্ঞান-আকাদামীর সদস্য নির্বাচিত
১৭০৩ খৃঃ রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি পদে নির্বাচিত এবং জীবনের বাকী ২৫ বছর (আমৃত্যু) ঐ পদে বহাল থাকা। ১৭০৫ খৃঃ রাজসম্মান 'নাইট্' উপাধি লাভ।

শেষ জীবন ঃ পুনরায় পার্লামেণ্টের সদস্য-পদের প্রার্থী হওয়া এবং পরাজয়। রাজনৈতিক জীবনের অবসান।

ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে রচনা প্রকাশ কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। ৮০ বছর বয়সে স্মৃতিভ্রংশ স্বরু।

১৭২২ খৃঃ পাথুরে রোগের আক্রমণ। সঙ্গে বাতরোগ। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য শহর থেকে দূরে কেন্‌সিংটনের এক গ্রামে আগমন।

১৭২৭ খৃঃ শেষ বার রয়্যাল সোসাইটির সভাপতিরূপে সভায় যোগদান। ফিরে এসে অসুস্থতা বোধ এবং রোগবৃদ্ধি।

মৃত্যু ঃ ১৮ই মার্চ, ১৭২৭ খৃঃ শেষরাত্রে জীবনদীপ নির্বাপিত। ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবির বিখ্যাত প্রাঙ্গণে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের পাশে সমারোহের সঙ্গে নশ্বর দেহ সমাধিস্থ।



মহাবিজ্ঞানী নিউটন

১

১৬৪২ খৃষ্টাব্দ, ২৫শে ডিসেম্বর।

অর্থাৎ যেদিনটিতে মহামানব যীশু খৃষ্টের আবির্ভাব হয়েছিল এ দিনটিও ছিল সেই স্মরণীয় পুণ্যতিথির একটি।

কল্পনায় দেখছি—ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট গ্রাম। দারুণ শীত। বাইরে ঝুর ঝুর ক'রে বরফ পড়ছে। ভিতরে, ঘরের এক কোণে, একটি সদ্যোজাত শিশু মায়ের বুক আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে। অসম্ভব রকম ছোট্ট সেই শিশু, ওজনে দেড় সেরও হবে না। কতটুকুই বা ওর জীবনীশক্তি? যে ভাবে ধুক্‌পুক্ করছে, কে জানে আর কতক্ষণ ওকে টিকিয়ে রাখা যাবে!

দু'জন দাই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখনই একজন ডাক্তার ডেকে আনা দরকার, দেখা যাক যদি সে ডাক্তার কিছু করতে পারে! কিন্তু এই শীতে কেউ বাড়ীর বাইরে পা দেয়? কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই তারা চল্‌ল ডাক্তারের খোঁজে। কল্পনায় শুনতে

পাচ্ছি—পথে একজন আর একজনকে বলছে, "ডাক্তার তো এসে করবে কচু! সে এসে পড়বার ঢের ঢের আগেই ওই ছোট্ট একরত্তি বুকের ধুক্‌ধুকুনি যাবে থেমে। দেখে নিও আমার কথা ঠিক কিনা। দেড় সের—অর্থাৎ কিনা তিন পাউণ্ড ওজনের মানুষ কখনও বাঁচে ?—বিশেষ করে এই বরফ-জমানো শীতে ?"

তখন কি তারা স্বপ্নেও ভেবেছিল—এই ছোট্ট শিশু শুধু বাঁচবেই না, এই শিশুরই প্রতিভায় সারা ইংল্যাণ্ডের মুখ শত শত বছর ধ'রে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে! আর তারা নিজেরা? অনন্ত কালস্রোতে ক্ষণিক বুদ্‌বুদের মত ভেসে উঠে কোথায় তলিয়ে যাবে কেউ তার খোঁজ রাখবে না। বরঞ্চ, যদি বা কেউ রাখে, তবে এই ভেবেই রাখবে যে তারা ঐ শিশুটির জন্মসময়ে তার খানিকটা পরিচর্যা করেছিল। কারণ ঐ শিশুটি আর কেউ নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী স্যর্ আইজাক নিউটন।

১৬৪২ খৃষ্টাব্দ।

আরও ছ'টো দিক্ দিয়ে এই বছরটি স্মরণীয় বলা যেতে পারে। এই বছরেই ইটালির মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিও পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। কে জানে, হয়তো পৃথিবীর আর এক অঞ্চলে তাঁরই উপযুক্ত একজন উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব হ'ল দেখে বিধাতা নিশ্চিন্ত মনে তাঁকে টেনে নিয়েছিলেন নিজের কাছে। আর একটি ঘটনা ছিল ইংল্যাণ্ডের ঘরোয়া ব্যাপার—যদিও পৃথিবীর ইতিহাসে তার ছাপ রয়ে গেছে। ঐ বছরই সুরু হয় ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ বা 'সিভিল ওয়ার'—রাজার দলে আর প্রজার দলে। তার কথা ইতিহাসের কোন্ ছাত্র না জানে?

অবশ্য উল্‌স্‌থর্প—অর্থাৎ সেই ছোট্ট গ্রামটি যার কথা দিয়ে প্রথমেই আমার এ কাহিনী সুরু করেছি,—সেখানে এই ছ'টি ঘটনার কোনটি কোন রেখাপাত করেছিল কিনা সন্দেহ। 'থর্প্' মানে গ্রাম—নেহাৎই ছোট্ট গ্রাম,—পাড়াগাঁ বলতে আমরা যা বুঝি তাই।

কাছাকাছি সহর বলতে গ্র্যাণ্টহাম—তাও মাইল সাতেক দূরে। আর গ্র্যাণ্টহামও এমন কিছু বড় সহর নয়। নিউটন জন্মেছিলেন বলেই উল্‌স্‌থর্পের নাম আজ সভ্য জগতে পরিচিত হয়ে গেছে, নইলে কে-ই বা মনে করে রাখত লিংকনশায়ার অঞ্চলের এই অখ্যাত, অপরিচিত গ্রামটিকে?

কিন্তু গ্রাম নিয়ে কথা নয়, কথা হচ্ছে তার মানুষ নিয়ে। নিউটনের মত মানুষ যে গ্রামে জন্মান সে গ্রাম নিশ্চয়ই বিজ্ঞান-সাধকদের তীর্থক্ষেত্র। কে জানত মেদিনীপুর জেলার অখ্যাত বীরসিংহ গ্রামের কথা, যদি বিদ্যাসাগরের মত লোক সেখানে জন্মগ্রহণ না করতেন?

তবে উল্‌স্‌থর্প গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশু নিউটনের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটুকু ভুললে চলবে না।

আইজাক্ নিউটনের বাবার নামও ছিল আইজাক্ নিউটন। আসলে তিনি ছিলেন চাষী। তবে চাষী বলতে আমাদের দেশে আমরা যা বুঝি ওদেশের চাষী ঠিক তা নয়। ওখানকার অনেক চাষীই বেশ অবস্থাপন্ন। আইজাক্‌ও ছিলেন এই রকমই এক অবস্থাপন্ন চাষী। তার ওপর তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন ঐ অঞ্চলেরই এক অপেক্ষাকৃত বনেদী পরিবারে। এঁরা অ্যাস্‌কফ্ পরিবার নামে পরিচিত। আইজাক্ এঁদেরই একটি মেয়ে—হ্যান্না অ্যাস্‌কফ্‌কে বিয়ে ক'রে এনে সংসার পাতলেন।

কিন্তু সংসারভোগের সুখ তাঁর জন্য লেখা ছিল না। বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই, নিতান্ত অপরিণত বয়সে, আইজাকের মৃত্যু হ'ল। তাঁর পত্নী হ্যান্না তখন সন্তানসম্ভবা।

এই ভাবে জন্মের আগেই বাপকে হারিয়ে পৃথিবীতে আসতে হ'ল নিউটনকে—বিধবা মায়ের কোলে। পরলোকগত স্বামীর নাম দিয়েই হ্যান্না ছেলেরও নাম রাখলেন আইজাক্। বাপ ও ছেলের একই নাম হ'ল,—আইজাক্ নিউটন।

ইংরেজ সমাজে যেমন বিপত্নীকের, তেমনি বিধবারও পুনর্বিবাহ বরাবরই চলে আসছে। নিউটনের মাও তাই স্বামীর মৃত্যুর বছর দুই পর আবার বিয়ে করলেন একজন পাদ্রীকে—বার্নাবাস স্মিথ তাঁর নাম। স্মিথ থাকতেন উত্তর উইথাম বলে একটি জায়গায়। অবস্থাও তাঁর মোটামুটি ভালই ছিল। গীর্জার লোক ব'লে মান-সম্ভ্রমও ছিল কিছুটা। তার ওপর স্বভাবটাও ছিল বেশ মোলায়েম।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও স্মিথ প্রথমেই ছেলে-সমেত "তৈরী সংসার" পাততে রাজী ছিলেন না। তাই ঠিক হ'ল আইজাক্ উল্‌স্‌থর্পেই থাকবেন, তাঁর দিদিমার কাছে; মামারা তাঁকে দেখবেন। হান্না চলে যাবেন নতুন স্বামীর কাছে, তাঁর কর্মস্থলে।

তাই করা হ'ল। নতুন সংসারে গিয়ে হান্নার দিনগুলি মোটামুটি ভালোই কাটতে লাগল; অবশ্য ছেলের জন্য যে মাঝে মাঝে মন কেমন করত না এমন নয়। ক্রমে তাঁর আরও তিনটি ছেলেমেয়ে হ'ল। দু'টি মেয়ে, একটি ছেলে। ওদিকে নিউটন দিদিমার কাছে মানুষ হতে লাগলেন।

দিদিমার কাছে মানুষ হতে লাগলেন নিউটন। মায়ের অভাব পূর্ণ করলেন দিদিমা।

উল্‌স্‌থর্পের পাশেই স্কিলিংটন আর স্টোক্‌স। প্রথমটা সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'ল নিউটনকে। বাড়ী থেকেই সেখানে যাওয়া-আসা করা চলত। কিন্তু আর একটু বড় হ'লে সে ব্যবস্থা পাল্টাতে হ'ল। গ্র্যান্থাম শহরে ছিল একটা গ্রামার স্কুল, ঠিক হ'ল নিউটন এবার থেকে সেইখানে পড়বেন। উল্‌স্‌থর্প থেকে গ্র্যান্থাম শহরের দূরত্ব প্রায় সাত মাইল। অতটুকু ছেলের পক্ষে রোজ অতখানি রাস্তা পার হয়ে স্কুলে যাতায়াত তো সম্ভব নয়, তাই গ্র্যান্থাম শহরেই তাঁর থাকবার একটা ব্যবস্থা করতে হ'ল।

নিউটনের মা'র এক সই থাকতেন গ্র্যান্থামে। মিসেস ক্লার্ক তাঁর নাম। সেই সম্পর্কে তাঁরই বাড়ীতে নিউটনের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। মিঃ ক্লার্কের ছিল একটা ছোট ওষুধের দোকান। লোকটিও তিনি ছিলেন বেশ অমায়িক। বালক নিউটনকে তিনি খুশিমনেই বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। আশ্রয় দিয়েছিলেন ব'লেই আজও ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম লেখা হয়ে আছে। নইলে'কে-ই বা মনে করে রাখত এক অখ্যাত শহরের ততোধিক অখ্যাত এক কম্পাউণ্ডারের নাম?

স্কুলে প্রথম দিকে ভাল ছেলে বলে নিউটনের মোটেই সুনাম ছিল না, বরং মাস্টার মশাইদের কেউ কেউ তাঁকে "মোটা-মাথা" ব'লেও বিদ্রূপ করতেন। হঠাৎ একটা ঘটনায় কিন্তু ব্যাপারটার মোড় ঘুরে গেল। ভাল মানুষ পেয়ে নিউটনের ক্লাসের সঙ্গীরা প্রায়ই তাঁর পেছনে লাগত। একদিন তারা একটু বাড়াবাড়ি শুরু করল, আর এই ব্যাপারে প্রধান অংশ নিল যে ছেলেটি সে ছেলেটি

ছিল ক্লাসের ভাল ছেলেদের দলে—লেখাপড়ার দিক্ দিয়ে। নিউটন অন্যান্য দিন কিছু বলতেন না, কিন্তু সেদিন আর সহ্য করতে পারলেন না। ফলে সুরু হ'ল কথা কাটাকাটি, এবং একটু পরেই হাতা-হাতি—মারামারি—দস্তুরমত লড়াই। কিল, চড়, ঘুষি দু'জনেই



হাতাহাতি—মারামারি—দস্তুরমত লড়াই

সমানে চালিয়ে যেতে লাগল। শেষে জাপটাজাপটি। লড়াই যখন শেষ হ'ল তখন দেখা গেল নিরীহ গোছের নিউটনই জিতেছেন। সেই দিন থেকে আর আর সঙ্গীরা তাঁকে সমীহ করতে সুরু করল। কিন্তু নিউটন তাতেই খুশী ন'ন। ঐ ছেলেটা মারামারিতে তাঁর কাছে হারলেও লেখাপড়ায় তো তাঁর ওপরে রয়েছে! ওখানেও তাকে হারাতে না পারলে আর কি হ'ল? খুব মন দিয়ে পড়াশোনা সুরু করে দিলেন নিউটন এবং অল্পদিন পরেই দেখা গেল—ঐ

ছেলেটা তো বটেই, ক্লাসের আর সব 'ভাল ছেলেকে'ও হারিয়ে তিনি একেবারে ক্লাসের সেরা ছাত্র হয়ে পড়েছেন। স্কুলময় তাঁর জয়-জয়কার। মাস্টার মশাইরাও তাঁর সম্বন্ধে মত বদলে ফেললেন।

কিন্তু লেখাপড়ায় ভাল হবার আগেও হাতের কাজে নিউটন কম ওস্তাদ ছিলেন না। মুখচোরা, লাজুক প্রকৃতির স্বভাব হওয়ায় বন্ধু-বান্ধব তাঁর খুব বেশী ছিল না—তাঁর সময় কাটত নানারকম টুকিটাকি হাতের কাজ নিয়ে। অন্য ছেলেরা যখন মাঠে দৌড়ঝাঁপ করছে কিংবা ঘরের কোণে বসে আড্ডা দিচ্ছে বা খেলা করছে, তখন নিউটনকে দেখা যেত একরাশ কাঠের টুকরো এবং হাতুড়ি, বাটালি আর করাত নিয়ে এটা ওটা তৈরী করছেন, কিংবা হয়তো কাগজ পেতে নানারকম জীবজন্তু, গাছপালার ছবি আঁকছেন, কিংবা হয়তো ঝুলি কাঁধে ক'রে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসের ভারে তাঁর ঝুলি ভরে উঠছে। গাছের পাতা, ফুল, ফল, প্রজাপতি, এমন কি নতুন ধরনের পাথরের টুকরো—কি নেই তাতে?

হাতের কাজ করতে নিউটন এত ভালবাসতেন যে এজন্য এক সেট যন্ত্রপাতি সর্বদা তাঁর হাতের কাছে থাকত। হাতুড়ি, বাটালি, তুরপুন, র‍্যাঁদা, করাত, স্ক্রু-ড্রাইভার, উকো—সবই ছিল তার মধ্যে, আর এই সব যন্ত্রপাতি বালক নিউটন নিজের হাতেই তৈরী করে নিয়েছিলেন। নাতির কাণ্ড দেখে দিদিমা বলতেন, "আইজাক্ আমার বড় হয়ে বেশ ভাল একজন কারিগর হবে, তোমরা দেখে নিও।" পাড়া-প্রতিবেশীরাও ভাবত, বড় হয়ে নিউটনকে রুজী-রোজগারের জন্য নিশ্চয়ই ভাবতে হবে না। এতটুকু বয়সে যার এমন সুন্দর হাতের কাজ, বড় হয়ে সে নিশ্চয়ই নতুন নতুন ধরনের আসবাবপত্র বানিয়ে ভাল রকমই রোজগার করতে পারবে। কেউ কেউ বলত, "না, আইজাক্ আরও বড় হবে। কাঠের আসবাব নয়—দস্তুরমত জমকালো বাড়ীঘর বানাবে ও।" দু'-একজন ওর দিদিমাকে

পরামর্শও দিল, "ওর ওপর পড়াশোনার চাপ না দিয়ে ওকে এখন থেকেই কোন ঘড়ির দোকানে ঢুকিয়ে দাও। এ সব দিকে ওর যে রকম ঝোঁক তাতে কালে ও নিজেই ঘড়ি-টড়ি তৈরী ক'রে ভাল ব্যবসা ফাঁদতে পারবে।"

তাদের এই রকম পরামর্শ দেবার একটা কারণও ছিল। ঐটুকু বয়সেই নিউটন নিজের মাথা খেলিয়ে দু'টি আশ্চর্য ঘড়ি তৈরী করে ফেলেছিলেন। একটি 'জল-ঘড়ি' আর একটি 'সূর্য-ঘড়ি'। পরবর্তী জীবনে যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দেখিয়ে তিনি সমস্ত বিশ্বজগৎকে স্তম্ভিত করে দেন এখান থেকেই তার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গাঁয়ের লোকদের পক্ষে তার তাৎপর্য বোঝা সম্ভব ছিল না।

বাস্তবিক নিউটনের ছেলেবেলার এই সব খেলা আর খেলনা তৈরীর ভিতরেই, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে, ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক নিউটনকে খুঁজে পাওয়া যায়। জল-ঘড়িটার কথাই ধরা যাক্ না কেন! প্রায় চার ফুট উঁচু একটা কাঠ কেটে এই ঘড়িটি তৈরী করা হয়েছিল। ঘড়ির মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল যাতে জল দিয়ে ভর্তি করে দিলে একটা সরু ফুটো দিয়ে সে জল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে পড়তে আরম্ভ করত। জল বাড়ার বা কমার সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঠও ওঠা-নামা করত। সেই কাঠের পাশ বরাবর ১, ২, ৩ ক'রে ঘন্টা-জ্ঞাপক চিহ্ন বসানো ছিল। সেটাই হ'ল ঘড়ির ডায়াল। কাঠ কোন্ দাগে উঠল দেখে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে দেওয়া যেত ক'টা বেজেছে। নিউটন প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে নিজে হাতে ঘড়িতে জল ঢেলে রাখতেন, আর মাঝে মাঝে জল বেরোবার ছিদ্রটাকে পরিষ্কার করে দিতেন— যাতে ময়লা জমে সেটা আরও সরু হয়ে না যায়। ছিদ্র সরু হয়ে গেলে ঘড়িও যে স্লো চলতে থাকবে!

যেমন জল-ঘড়ি তেমনি তাঁর সূর্য-ঘড়ি। সূর্যের আলোয় একটা কাঠি পুঁতে রাখলে মাটীতে তার ছায়া পড়ে। কিন্তু দিনের সমস্ত সময়

এই ছায়া একই রকম থাকে না,—কখনও খুব লম্বা হয়, তারপর কমতে কমতে এক সময় একেবারে ক্ষীণ হয়ে আসে। তার পরে আবার সেটা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। বালক নিউটন সূর্যের আলোয় ছায়ার এই গতিবিধি খুব ভাল করে লক্ষ্য করতেন। দেখে দেখে তাঁর মনে হ'ল—এই ছায়া নিয়েও তো চমৎকার একটা ঘড়ি বানানো যেতে পারে! যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। নিউটন দেখতে দেখতে



বাড়ীর উঠোনে এই রকম একটা ঘড়ি বানিয়ে বসিয়ে ফেললেন

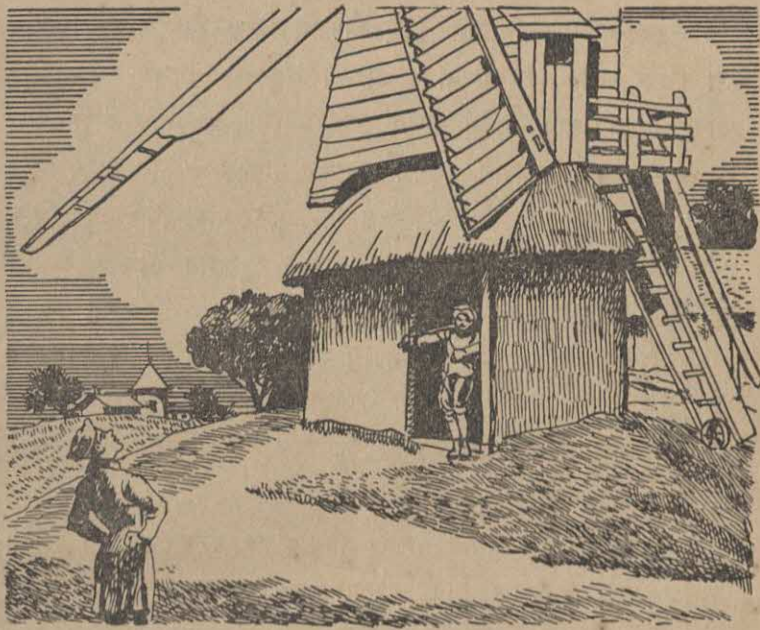
বাড়ীর উঠোনে এই রকম একটা ঘড়ি বানিয়ে বসিয়ে ফেললেন। জল-ঘড়ির মত এখানেও আঁচড় কেটে কেটে ঘণ্টা, মিনিটের চিহ্ন বসানো হ'ল। একটা ডাণ্ডা এমন ভাবে রাখা হ'ল যে তার ছায়া ঐ দাগগুলোর ওপর পড়ে। কখন কোন্ দাগে ছায়ার মাথা হাজির হ'ল দেখে নিখুঁত ভাবে সময় বলে দিতে পারতেন নিউটন।

রাত্রে অবশ্য এ ঘড়ি কোন কাজে লাগত না ; মেঘলা দিনেও না। কিন্তু তখনকার জন্য তো তাঁর জল-ঘড়িই রয়েছে! নিউটনের তৈরী সেই সূর্য-ঘড়িটি নাকি আজও উল্‌স্‌থর্প গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়।

শুধু ঘড়ি নয়, আরও দু'-একটি জিনিসের কথা বলি। তখনকার দিনে মধ্য ইয়োরোপের কোন কোন জায়গায় কল-কারখানা চালাবার জন্য 'উইণ্ড্ মিল্' বা হাওয়া-কলের চল ছিল। বিশেষ করে কূয়ো থেকে জল তুলতে বা গম ভেঙ্গে পেষাই করে আটা-ময়দা তৈরী করতে এই ধরণের কল খুবই কাজে লাগত। খান তিন-চার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের পাখা বা ব্লেড,—এমন কৌশলে বসানো যে একটু হাওয়া লাগলেই তা ঘুরতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই টানে কলের কাজও সুরু হয়। নিউটনদের বাড়ীর কাছেও এই রকম একটা হাওয়া-কল বসানো হ'ল গম পেষাই করার জন্য। গাঁয়ের ছেলেরা দল বেঁধে এই কল দেখতে যেত আর অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। নিউটনও যেতেন এবং বিস্মিতও হতেন নিশ্চয় ; কিন্তু ঐটুকুতেই তিনি তৃপ্ত হতেন না। কলে কি ভাবে কাজ হচ্ছে, কোথায় কোন্ কলকজা বসানো হয়েছে, কোন্‌টার গড়ন কি রকম—সব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেন। তার পর একদিন দেখা গেল নিউটন তাঁর যন্ত্রপাতি আর কাঠকুটো নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে কি কাজে লেগে গেছেন! কয়েকদিন পরেই সকলে দেখে, ও মা, কি আশ্চর্য! নিউটন অবিকল ঐ রকম একটি খেলনার হাওয়া-কল তৈরী করে ফেলেছেন! কলের কোনও খুঁটিনাটি অংশই বাদ দেন নি তিনি। এমন কি ওর মধ্যে একমুঠো গম ফেলে দিয়ে দেখা গেল তা দিব্যি পেষাই হয়ে ময়দার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসছে। সবাই অবাক্, 'বাঃ রে ছেলে, বাঃ!'

কিন্তু হাওয়া-কল চালাতেও তো একজন লোক লাগে, যাকে বলা হয় 'মিলার' বা কলের চালক। সবাই হাসতে হাসতে বল্‌ল,

"আইজাক, কল তো বানিয়েছ, কিন্তু তোমার কলের চালক কোথায়? মিলার হবে কে?"



সব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেন

বাস্তবিক একজন মিলার না হ'লে মানায় কি ক'রে? ভাবতে লাগলেন নিউটন। হোক্ না খেলনার কল, সবই যখন পরিপাটি ক'রে বানানো হয়েছে তখন ঐ একটা খুঁতই বা থেকে যাবে কেন? কিন্তু অতটুকু মিলারই বা কোথায় পাওয়া যাবে? ভারী ভাবনায় পড়লেন নিউটন।

কিন্তু দু'দিন পরেই দেখা গেল নিউটনের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সবাইকে ডেকে বললেন, "দেখে যাও আমার কলের চালককে—আমার মিলারকে, সত্যি সত্যি ও কেমন কল চালাচ্ছে দেখ!"

সবাই অবাক্ হয়ে দেখে, কলের মধ্যে একটা ছোট্ট ইঁদুর বসে আছে। ইঁদুর যেই উঠে ঘুর ঘুর করছে অমনি কলও চলতে স্থুরু করছে। অবাক্ কাণ্ড!

ইঁদুরকে দিয়ে নিউটন কি কৌশলে কাজ হাসিল করেছিলেন তা কেউ ধরতে পারল না। হয়তো ইঁদুরের পায়ের সঙ্গে আর কলের চাকার সঙ্গে একটা সূতো এমন ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যাতে ইঁদুরের পায়ে টান পড়লেই কলের চাকাতেও টান পড়ে, আর চাকা ঘুরতে থাকে। কলের ভিতর গম ছড়িয়ে দিলেই ইঁদুর এগিয়ে যেত সেই গম খাবার জন্য, আর তখনই সূতোয় টান পড়ে কল চলতে স্থুরু করত।

এই রকম আকাশে লণ্ঠন ওড়ানোও ছিল নিউটনের একটি নিজের আবিষ্কৃত খেলা। শীতের দেশ, শীতকালে সকালের দিকে ওখানে ঘন কুয়াসায় চারদিক্ আচ্ছন্ন করে রাখে, তাই দিনের বেলাতেও অনেকে লণ্ঠন হাতে করে চলাফেরা করত ওখানে। নিউটনও অনেক সময় স্কুলে যাবার পথে লণ্ঠন হাতে করে যেতেন। তবে অন্যান্য লণ্ঠনের সঙ্গে তাঁর লণ্ঠনের একটু তফাৎ ছিল। সাধারণ লণ্ঠন তিনি পছন্দ করতেন না, রঙ্গিন কাগজ দিয়ে তৈরী রং-চংএ ফানুসের মত লণ্ঠন ছিল তাঁর প্রিয় আর সে লণ্ঠন তিনি নিজেই তৈরী করে নিতেন। আজকাল যে রং-চংএ জাপানী কাগজের লণ্ঠন দেখা যায় নিউটনের সে লণ্ঠনও হয়তো সেই ধরনেরই ছিল।

শুধু কাগজের লণ্ঠন নয়, কাগজের ঘুড়িও তৈরী করতেন নিউটন। ঘুড়ি ওড়ানোর শখ প্রায় সব দেশের ছেলেদের মধ্যেই প্রচলিত; কিন্তু শোনা যায়, নিউটনের আগে নাকি ও-অঞ্চলে ছেলেদের মধ্যে ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ ছিল না। নিউটনই নাকি প্রথম কাগজের ঘুড়ি বানিয়ে তা ওড়াবার কৌশল শিখিয়ে দেন তাঁর গাঁয়ের ছেলেদের। কোথা থেকে তিনি এই কৌশল শিখেছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। হয়তো কোথাও ওর বর্ণনা পড়ে নিজেই

মাথা খাটিয়ে ঘুড়ি বানাতে ও ওড়াতে শিখে নিয়েছিলেন—কে জানে! নিউটনের মত কৌশলী ছেলের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যাই হোক, ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে একদিন তাঁর খেয়াল হ'ল, আচ্ছা, ঘুড়ির সঙ্গে যদি একটা কাগজের লণ্ঠন বেঁধে দেওয়া যায় তা হ'লে



নিউটনের লণ্ঠন ঘুড়ির পিঠে চেপে মেঘলোকের উদ্দেশে পাড়ি জমা'ল

কি তা আকাশে তোলা যায় না? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কয়েক দিনের চেষ্টাতেই নিউটনের লণ্ঠন ঘুড়ির পিঠে চেপে মেঘলোকের উদ্দেশে পাড়ি জমাল। রাতের অন্ধকারে আকাশে উড়ন্ত আলো দেখে গ্রামশুদ্ধ লোক তো অবাক্! এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড!

৩

নিউটনের বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন মিঃ বার্নাবাস স্মিথ্ মারা গেলেন। হান্না দ্বিতীয় বার বিধবা হয়ে আবার ফিরে এলেন উল্‌স্‌থর্পে। তাঁর আর তিনটি ছেলেমেয়ে—মেরী, হান্না ও বেঞ্জামিন্‌ও সঙ্গে এল।

সংসার বেড়ে গেল। সংসার চালাবার জন্য হান্নাকে এখন থেকে তাঁদের চাষ-আবাদের ওপরই বেশী নির্ভর করতে হ'ল। অবশ্য মিঃ স্মিথেরও কিছু সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু ঐ সময় ক্রমাগত গৃহ-যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে সে সম্পত্তির আয় তেমন কিছু হ'ত না। হান্নার পক্ষে একা সব কিছু দেখাশোনা সম্ভব হ'ত না, তাই তিনি ঠিক করলেন নিউটনকে স্কুল ছাড়িয়ে বিষয়কর্মের তত্বাবধানে লাগিয়ে দেবেন। নিউটন স্কুল ছেড়ে চলে এলেন ক্ষেত-খামারের কাজে।

কিন্তু যে লোক সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের ভার নিয়ে জন্মেছে সামান্য ক্ষেত-খামারের কাজ তার মনকে টানবে কি ক'রে? নিউটন অবশ্য মা'র কথার অবাধ্য হবার ছেলে ন'ন, কিন্তু যে কাজে তাঁর আদৌ মন বসে না সে কাজ তাঁকে দিয়ে জোর ক'রে করালেও তা হবে কেন? নিউটনের তখন পড়াশোনার দিকে ঝোঁক চেপেছে। স্কুলের গতানুগতিক পড়া নয়,—পৃথিবীকে জানবার—চিনবার—শিখবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে। গ্র্যান্টহামে মিঃ ক্লার্কের বাড়ীতে তাঁর মনের কিছু কিছু খোরাক তিনি পেয়েছিলেন। প্রথমতঃ, ক্লার্কের ছিল ওষুধের দোকান। নানা রকম রাসায়নিক ওষুধপত্র, মালমশলায় তা সর্বদা ভর্তি থাকত। নিউটনও মাঝে মাঝে সে সব নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সুযোগ পেতেন। হাতের কাজের ওপর কি রকম তাঁর ঝোঁক ছিল তা তো আগেই বলেছি। ফলে হ'ল কি, রসায়নশাস্ত্রের ওপরেও তাঁর একটা প্রগাঢ় আগ্রহ

দেখা দিল। তার ওপর ক্লার্কের বাড়ীতে ছিল একগাদা পুরোনো বই,—নানান্ ধরনের, নানান্ বিষয়ের। আর কেউ তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না, কিন্তু নিউটন তারই মধ্যে এক পরম সম্পদ্ আবিষ্কার করলেন। অবসর পেলেই তিনি সেই সব বই খুলে তার মধ্যে তন্ময় হয়ে ডুবে যেতেন। এমন ছেলেকে ক্ষেত-খামারের কাজে দিয়ে কি হবে?

তবু চেষ্টা করা হ'ল। প্রতি শনিবার গ্র্যান্টহামে হাট বসত। হাটের দিনে নিউটনকে যেতে হ'ত সেখানে কেনা-বেচা করবার জন্য; অবশ্য সঙ্গে একজন পুরোনো চাকরও থাকত। কিন্তু কয়েক দিন পরেই দেখা গেল নিউটন আর হাটের ত্রিসীমানায় নেই। কেনা-বেচার কাজ—দরদস্তুর যা করবার সবই করছে সেই চাকর। নিউটন সেই অবসরে চলে আসছেন ক্লার্কের বাড়ীর ছাদে, যেখানে সেই মহামূল্য বইগুলি জড় করা রয়েছে চিলেকোঠার এককোণে—তাঁরই অপেক্ষায়। কিংবা হয়তো সটান চলে যাচ্ছেন স্পিট্‌লগেট পাহাড়ের তলায়। সেখানে একটা নিরিবিলি গোছের ঝোপ বেছে নিয়ে তারই ছায়ায় কয়েকখানি বই নিয়ে বসে কাটিয়ে দিচ্ছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বুড়ো চাকর জানে তার মনিব কোথায় আছেন, কাজেই বাড়ী ফিরবার পথে সে তাঁকে ডেকে নেয়। তখন দু'জনে একসঙ্গে ফেরেন বাড়ী। যেন নিউটন হাটে গিয়ে কত কেনা-বেচাই না করে এলেন!

বলা বাহুল্য এ খবর বেশী দিন চাপা রইল না। নিউটনের মা হান্না বড় মুশ্‌কিলে পড়লেন। ছেলে যদি ক্ষেত-খামারের কাজ না দেখে, বিষয়-আশয় নিয়ে মাথা না ঘামায়, তা হ'লে সে সব রক্ষাই বা পাবে কি ক'রে, আর তাঁদেরই বা চলবে কি ক'রে?

কিন্তু নিউটনের মামা ব্যাপার দেখে বললেন, "ওকে তোমার ফের স্কুলেই দিতে হবে। দেখছ না ওর ক্ষেত-খামারের দিকে একদম মন নেই! জোর করে কি কাউকে দিয়ে কোনও কাজ হয়?"

হেড মাস্টার মশাইও তাঁর কথায় সায় দিলেন এবং সাধ্যমত সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। নিউটন আবার এসে ভর্তি হলেন গ্র্যান্টহামের কিংস্ কলেজে।



কয়েকখানি বই নিয়ে ব'সে কাটিয়ে দিচ্ছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা

সত্যি, এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে। নিউটনকে যদি সত্যি মায়ের ইচ্ছেমত ক্ষেতের কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে হ'ত তা হ'লে বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে মানব জাতি আজ আরোও কয় শ' বছর পিছিয়ে থাকত কে বলতে পারে? অবশ্য নিউটনের মায়ের যে ছেলেকে স্কুলে পড়াতে অসাধ ছিল এমন মনে করবার কারণ

নেই। সংসারের ভাবনা আর বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার ভাবনা তাঁকে ব্যাকুল করে তোলাতেই হয়তো তিনি ঐ রকম সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এখন, সকলের কথায়, খুশীমনেই তিনি ছেলেকে আবার স্কুলে পড়াবার ব্যবস্থা করলেন।

স্কুলে ফিরে এসে নিউটনের আনন্দ আর ধরে না। ইচ্ছেমত বই পড়, মনের সাধে ইচ্ছেমত টুকিটাকি জিনিস তৈরী কর। ভারী মজা!

এই সময় থেকেই বালক নিউটনের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সব কিছু জানবার একটা অদম্য পিপাসা! রহস্যময়ী প্রকৃতি, কিন্তু নিউটন যেন তার রহস্য উদ্ঘাটন করবেনই। একজন লেখক এ সম্বন্ধে একটা ভারী চমৎকার চিত্র দিয়েছেন। ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৬৫৮। সমস্ত ইংল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে সেদিন বয়ে চলেছে প্রচণ্ড ঝড়। লণ্ডন সহরও তা থেকে রেহাই পায় নি। আর এই লণ্ডন সহরেরই এক অংশে সেদিন অলিভার ক্রম্‌ওয়েল মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন। বন্ধুদের তিনি শেষ বার কি বলতে গেলেন, কিন্তু বাইরের ঝড়ের দাপটে তাঁর একটি কথাও শোনা গেল না। আর ঠিক সেই সময়, ঐ ইংল্যাণ্ডেরই আর এক প্রান্তে, উল্‌স্‌থর্পের এক খোলা মাঠের ওপর একটি বছর ষোল বয়সের ছেলে একা দাঁড়িয়ে আছে। উন্মত্ত ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছে ছেলেটি? বাতাসের শক্তি পরীক্ষা করছে সে। একবার যে দিকে বাতাস বইছে সেই দিকে লাফ দিচ্ছে, মেপে দেখছে কতটা এগিয়ে গেল; আবার পরমুহূর্তে বাতাসের বিপরীত দিকে লাফ দিয়ে দেখছে—এবারে কতটা যাওয়া গেল। এই ভাবে বার বার পরীক্ষা করে হাওয়ার বেগ—ঘণ্টায় কত মাইল বেগে সে হাওয়া ছুটছে তাই বার করার চেষ্টা করছে ছেলেটি। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই সময়টা কি পরিবর্তন হয়ে গেল সে খবর সে রাখে না—রাখবার প্রয়োজনও তার নেই। তার

চেয়ে অনেক—অনেক বড় রহস্য উদ্ঘাটনের ভার তার ওপর, আর



ঘণ্টায় কত মাইল বেগে সে হাওয়া ছুটছে তাই বার
করার চেষ্টা করছে ছেলেটি

তারই জন্য তখন থেকেই যেন তৈরী হচ্ছে সে। এই ছেলেটি আর কেউ নয়,—আইজাক নিউটন।

দেখতে দেখতে গ্র্যান্টহামের পড়া শেষ হ'ল। ম্যাট্রিক পাশ করলেন নিউটন। এবারে বিশ্ববিদ্যালয়। আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে নিউটন গ্রাম ছেড়ে চলে এলেন কেম্ব্রিজে। সেখানকার বিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর।

এখন যেমন, তিনশ' বছর আগেও তেমনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নামডাক ছিল। আবার তার মধ্যে ট্রিনিটি কলেজ ছিল আরও নাম-করা। ট্রিনিটি কলেজের সে ঐতিহ্য আজও অব্যাহত আছে।

মফঃস্বলের ছেলে নিউটন, তা ছাড়া স্বভাবতঃই তিনি একটু মুখচোরা। আর কেম্ব্রিজে যারা পড়তে আসে তাদের অনেকেই ইংল্যাণ্ডের বড় বড় বনেদী পরিবারের ছেলে। কাজেই তাদের সঙ্গে নিউটনের খাপ খাবে কেন? নিউটন খেলাধূলার ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। আড্ডা তো দিতে জানতেনই না। এ সবের জন্যও তারা নিউটনকে একটু কৃপার চক্ষে দেখত। এ ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল যার জন্য অন্য ছাত্রেরা নিউটনকে আমল দিতে চাইত না। কেম্ব্রিজের মত ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া হ'তে হলে যে পরিমাণ টাকার দরকার হয় প্রতি মাসে, বাড়ী থেকে তত টাকা নিউটনকে পাঠান সম্ভব হ'ত না। এজন্য নিউটনকে খানিকটা সময় কলেজের নানা কাজ করে দিতে হ'ত। অবশ্য এই ভাবে, নিজের খরচ যোগাবার জন্য কলেজে খানিকটা উপরি খেটে, পয়সা রোজগারের রেওয়াজ কেম্ব্রিজে বরাবরই ছিল। কিন্তু যে সব ছাত্র এই ব্যবস্থার সুযোগ নিত, অন্যান্য ছাত্রেরা—বিশেষ করে বড়লোকের ছেলেরা তাদের একটু হেয় চোখে দেখত। বিদ্যার্জনের জন্য এই ধরনের শ্রমের কি মর্যাদা তা বুঝবার শিক্ষাদীক্ষা তাদের ছিল না।

এই কারণেই নিউটনকে তারা এড়িয়ে চলত। তা, নিউটনের দিক্ দিয়ে এ এক পক্ষে ভালই ছিল বলা যেতে পারে। অন্য ছেলেরা



ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে পার হয়ে যেত তা নিজেও
বোধ হয় টের পেতেন না!

যখন নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ, হৈ-হল্লোড় ক'রে কাজে-অকাজে সময় নষ্ট করত, নিউটন তখন নিজের ঘরে বসে একমনে পড়াশোনার মধ্যে ডুবে থাকতেন। কখনও বা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী-ঘরে সময় কাটত তাঁর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে পার হয়ে যেত তা নিজেও বোধ হয় টের পেতেন না তিনি!

এই সময় থেকে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন তিনি। যে অঙ্কের বই দেখলে সাধারণ ছেলেদের অধিকাংশই আঁৎকে ওঠে, নীরস ব'লে ধারে-কাছে ঘেঁষতে

চায় না—সেই অঙ্কের বইয়ের মধ্যেও যে এত মধু থাকতে পারে তা নিউটন ছাড়া কে বুঝবে? শোনা যায় এর আগে তিনি জ্যামিতির বই তেমন পড়েন নি। হঠাৎ একখানা ইউক্লিডের জ্যামিতি তাঁর হাতে এল। এক নিঃশ্বাসে বইখানা শেষ করে ফেললেন তিনি। যিনি তাঁকে বইটা দিয়েছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কেমন লাগল ইউক্লিড্? বুঝতে-টুঝতে পারলে কিছু?"

নিউটন তাঁর দিকে বইটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "বইটা ভাল, কিন্তু না বোঝার কি আছে এতে? এ তো জলের মতো সোজা! যে সব জিনিস এতে প্রমাণ করা হয়েছে তাও তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ!"

শুধু অঙ্কশাস্ত্রই নয়, এই সময় নিউটন আরও নানান্ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতেন। লজিকের (ন্যায়শাস্ত্র) বই তাঁর বেশ ভাল লাগত। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও তাঁর মনকে কম আকৃষ্ট করত না। তবে সাহিত্যের দিকে যে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল এমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না—বরঞ্চ এর উল্টোটাই মনে হয়। যদিও, শোনা যায়, আর আর অনেক ছেলের মত প্রথম বয়সে নিউটনও দু'-চারটে কবিতা লিখবার চেষ্টা করেছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর সেই কবিযশের আকাঙ্ক্ষা আর কখনও দেখা যায় নি। সব জিনিস সকলের জন্য নয়—এ জ্ঞানটা বোধ হয় তাঁর ছেলেবয়সেই বোধগম্য হয়েছিল। তা ভালই হয়েছিল হয়তো। কবি হিসেবে নিউটন খুব যে সাফল্য লাভ করতেন তাঁর চাল-চলন দেখে এ রকম অনুমান করার কোন কারণ নেই। বরঞ্চ ওদিকে সময় নষ্ট না ক'রে তিনি যে তাঁর প্রিয় অঙ্কশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন এটা আমাদের পক্ষে পরম আশ্বাসের কথা বই কি! পৃথিবীতে মিল্টন, শেক্সপীয়ার, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের যেমন দরকার, তেমনি নিউটন, গ্যালিলিও, আইনস্টাইন বা জগদীশচন্দ্রেরও সমান প্রয়োজন। কিন্তু শেক্সপীয়ারের পক্ষে যেমন নিউটন হওয়া সম্ভব ছিল না, তমনি

নিউটনের পক্ষেও শেক্সপীয়ার হওয়া সম্ভব ছিল না কোন কালেই। নিউটন অল্প বয়সেই তা বুঝেছিলেন। কিন্তু সবাই কি তা বোঝে ?

লেখাপড়ার দিকে নিউটনের এই আগ্রহ তাঁর কলেজের অধ্যাপকদের চোখ এড়াল না। ফলে অনেকেই তাঁকে সুনজরে দেখতে লাগলেন এবং কারো কারো তিনি খুবই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে—অধ্যাপক ডক্টর আইজাক ব্যারো।

বিজ্ঞানী হিসাবে ডক্টর ব্যারোর তখন খুব নাম-ডাক। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক শাস্ত্র পড়াবার জন্য একটা খুব সম্মানিত পদ আছে, তাকে বলা হয় লিউকেসিয়ান অধ্যাপকের পদ। লিউকাস নামে এক ভদ্রলোকের নাম থেকেই পদটির এই নামকরণ হয়েছে। ডক্টর ব্যারো ছিলেন এই লিউকেসিয়ান অধ্যাপক এবং ওখানে এ পদে তিনিই সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন। এই ডক্টর ব্যারো অল্প পরিচয়েই নিউটনের প্রতিভা ধরতে পেরেছিলেন। তাই এই মেধাবী ছাত্রটিকে সব দিক্ দিয়ে সাহায্য করবার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। ডক্টর ব্যারোর এই স্নেহলাভ নিউটনের জীবনে একটা বড় আশীর্বাদ বলা যেতে পারে। কত ভাবে যে তিনি নিউটনকে সাহায্য করে গেছেন তার ঠিক নেই। অবশ্য এমন একটি ছাত্র পেলে সত্যিকার কোন্ শিক্ষক না নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করবেন ? আমাদের শাস্ত্রেও বলে—পুত্রের কাছে পিতার এবং শিষ্যের কাছে গুরুর পরাজয় ঘটলে সেটা পিতা বা গুরুরই বেশী গৌরব। বাস্তবিক, ঠিক মত ছাত্র বা শিষ্য গড়ে তোলা বড় কম কথা নয় তো! ডক্টর ব্যারো নিউটনকে এত পছন্দ করতেন, তাঁর প্রতিভাকে এত বড় ব'লে মানতেন যে তিনি নাকি প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতেন, "আমার এতদিন ধারণা ছিল আমি খুব ভাল অঙ্ক জানি, ও-বিষয়ে আমার সমকক্ষ বুঝি এ তল্লাটে কেউ নেই। কিন্তু এখন দেখছি, আমার

এই ছাত্রটির তুলনায় আমিও ঐ শাস্ত্রে নিতান্ত শিশু। আমার সমস্ত জাঁক ভেঙ্গে দিয়েছে এই ছোকরা নিউটন।"

যাই হোক, এইভাবে, অধ্যাপকের স্নেহ ও শুভেচ্ছা নিয়ে, নিউটন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হলেন। তখন তাঁর বাইশ বছর বয়স।

গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরেও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘুচল না, বরঞ্চ বাড়ল। সে কথায় পরে আসছি।

ঠিক এই সময়ে লণ্ডনে দেখা দিল ভয়াবহ প্লেগ মহামারী। এখনও প্লেগের নাম শুনলে আমাদের গা ছম্ ছম্ করে। তবু, এখন প্লেগের কত রকম চিকিৎসা বেরিয়েছে, টিকা বেরিয়েছে। কিন্তু তখন, সেই তিন শ' বছর আগে, প্লেগের কোন চিকিৎসাই প্রায় ছিল না। তা ছাড়া প্লেগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। দেখতে দেখতে লণ্ডন থেকে কেম্ব্রিজ, তার পর এদিক্ সেদিক্ আরও নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল এই রোগ। দলে দলে লোক মারা যেতে লাগল। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেল। সবাই এদিক্ ওদিক্ পালাতে সুরু করল। নিউটনও বেগতিক দেখে ফিরে এলেন তাঁর পুরোনো উল্‌স্‌থর্প গ্রামে।

প্লেগের উপদ্রব না কমা পর্যন্ত গ্রামেই রয়ে গেলেন নিউটন, এবং সে সময়টা বেশ দীর্ঘই বলা যেতে পারে।

গ্রামে ফিরে কি করলেন তিনি? আবার কি চেষ্টা করতে লাগলেন—এবার ক্ষেত-খামারের দিকে মন দেওয়া যায় কিনা? মোটেই না। নিউটন গ্রামে এসে মন দিলেন তাঁর সাধনায়—বিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধনায়। নিউটনের জীবনে এই সময়টা—প্রায় বছর দুই, অত্যন্ত স্মরণীয় কাল। যে আবিষ্কারের জন্য আজ তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন তার প্রায় প্রত্যেকটিরই সূত্রপাত হয় এই সময়ে। শুধু সূত্রপাত বললে ঠিক বলা হবে না, সেই সব সত্যের সন্ধান তিনি এই সময়েই পেয়ে গিয়েছিলেন বলা যেতে পারে।

সূর্যের আলো সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই নিউটনের মনে একটা অদম্য কৌতূহল ছিল। প্রথমে তিনি সেই আলোর রহস্য উদ্ঘাটনে লেগে গেলেন। কি ভাবে? একটা নমুনা দিচ্ছি শোন। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে জানালার খড়খড়ির গায়ে ছোট্ট একটা

ফুটো করে দিলেন তিনি, যাতে সেই ফুটো দিয়ে সূর্যের আলোর একটি মাত্র সরু রেখা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে।



জানালার খড়খড়ির গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো ক'রে দিলেন

সেই আলোর রেখার মধ্যে একটা ত্রিশিরা কাচ বসিয়ে দিলেন তিনি। এখন, সূর্যের সাদা আলো আসলে যে সাদা নয়—সাতটা রঙ্গিন আলো মিশে ঐ রকম সাদা দেখায় এ কথা আজ আমরা সবাই জানি। কিন্তু নিউটনের আগে সে কথা কেউ জানত না। আলো জিনিসটা যে আসলে কি সে সম্বন্ধেও কারো কোন ধারণা ছিল না—ওর ভিতরকার রহস্য জানা তো দূরের কথা! ত্রিশিরা কাচের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় সাদা আলোর ঐ বিভিন্ন অংশের প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা রেখায় ভেঙ্গে বেরিয়ে

আসে। নিউটনই তা প্রথম দেখলেন এবং আলোর রহস্য উদ্ঘাটন করলেন। সূর্যের আলোর এই সাতটা রং হচ্ছে—বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল ; ইংরেজীতে—ভায়োলেট, ইণ্ডিগো, ব্লু, গ্রীন্, ইয়োলো, অরেঞ্জ, রেড—সংক্ষেপে আদ্যক্ষর ধরে বলা হয় 'ভিবজিওর'। অবশ্য এ ছাড়াও নানা রকম রং আছে ওর মধ্যে।—যেমন আল্ট্রা-ভায়োলেট বা 'অতি-বেগুনী', ইন্‌ফ্রা রেড বা 'অব-লোহিত' ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে—সাধারণ চোখে এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।

নিউটন শুধু সূর্যালোকে সাতটা রংএর অস্তিত্বের কথাই প্রমাণ করলেন না, প্রত্যেকটি রশ্মি কেন অমন ভাবে আলাদা হয়ে দেখা সম্ভব তারও কারণ জানালেন। আলোর এই ধর্মের নাম হচ্ছে প্রতিসরণ, ইংরেজীতে যাকে বলে 'রিফ্র্যাক্‌শন'। আলোর রশ্মি কোন স্বচ্ছ হাল্‌কা মাধ্যম (যেমন বাতাস) থেকে স্বচ্ছ ঘন মাধ্যমে (যেমন কাচ) ঢুকলে এই ভাবে বেঁকে যায়, আবার তেমনি কোন স্বচ্ছ ঘন মাধ্যম থেকে স্বচ্ছ হাল্‌কা মাধ্যমে ঢুকলেও বেঁকে যায়। এরই নাম আলোর প্রতিসরণ। যে বিভিন্ন রশ্মি দিয়ে সূর্যের আলো তৈরী তার সবগুলি সমান ভাবে বেঁকে না। বেঁকে না বলেই প্রত্যেকটি রশ্মিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাশাপাশি দেখা সম্ভব। আকাশে রামধনু উঠলে কেন তা অমন সাত-রঙা দেখায় নিউটনের আবিষ্কারের জন্যই তা আমরা জানতে পেরেছি। নিউটন এই সব রশ্মি নিয়ে আরও বহু গবেষণা করেছেন। কোন্ রশ্মির কতটা প্রতিসরণ হয়, কি নিয়মে হয় ইত্যাদি হরেক রকম তথ্য বার করেছেন। মোট কথা, সূর্যের আলোর রহস্য তিনি এত দিক্ দিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন যে তাঁর আগে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। নিউটনের এই আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী বিজ্ঞানীরা আলো সম্বন্ধে আরও কত তথ্য বার করেছেন তার ঠিক নেই।

তবে একটা বিষয়ে নিউটনও ভুল করে ফেলেছিলেন। আলো জিনিসটা আসলে কি সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভুল হয়েছিল। নিউটন ভেবেছিলেন—আলো হচ্ছে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এমন একটা পদার্থ যা নাকি কোন উজ্জ্বল বা রঙ্গিন জিনিসের ওপর পড়লে ঠিকরে বেরিয়ে আসে—ঠিক যেমন করে দেয়ালের গায়ে বল ছুঁড়ে মারলে তা ঠিকরে ফিরে আসে। সেই ঠিকরে-আসা আলো আবার আমাদের চোখে এসে পড়ে, আর আমরা তাই থেকে বুঝি এই জিনিসটা এই রকম উজ্জ্বল, এই জিনিসটার এই রং।

আসলে কিন্তু তা নয়। 'পদার্থ' বলতে আমরা যা বুঝি আলো সে রকম কোন পদার্থই নয়। পদার্থ মাত্রকেই কতগুলি নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়—যে নিয়মের কোন কোনটা নিউটন নিজেই আবিষ্কার করে গেছেন। আলো যদি সেই রকম কোন পদার্থ হ'ত তবে তাকেও সে সব নিয়ম মেনে চলতে হ'ত। কিন্তু আলো তা মানে না। নিউটনের পরে হাইগেন্‌স্ নামে একজন বড় বিজ্ঞানী এই ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। তিনিই দেখিয়েছেন যে সত্যি আলো কোন 'পদার্থ' নয়,—আসলে আলো হচ্ছে ঈথরের মধ্যে একটা তরঙ্গ বা ঢেউ। আমাদের আশপাশে, মাথার ওপর যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে—যাকে আমরা শূন্য বা আকাশ বলি,—সেগুলো একদম ফাঁকা নয়। অদৃশ্য কিছু দিয়ে তা ভরাট করা। অবশ্য এই "অদৃশ্য কিছু"-কে পদার্থ বলা যায় না। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ঈথর। এই ঈথরে যখন কাঁপন বা ঢেউ ওঠে তখনই আলোর সৃষ্টি হয়। আর সে আলোর ধরনটা নির্ভর করে ঢেউএর আকার অনুযায়ী। বিদ্যুৎ বা ইলেক্‌ট্রিসিটিও যে এই রকম ঈথরের কাঁপন, এবং আলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ—পরে আমরা তাও জানতে পেরেছি। কিন্তু এখন সে প্রসঙ্গ থাক্। আমাদের বিস্ময় হচ্ছে এই, যে, যে নিউটন আলো সম্বন্ধে এত আশ্চর্য এবং অজানা সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন—যা নাকি একজন লোকের

পক্ষে এক কথায় 'বিস্ময়কর' বলা যেতে পারে, তিনিও এ রকম একটা ভুল ধারণা করে বসেছিলেন! যাই হোক, তবুও নিউটনের আবিষ্কারকেই এ পর্যন্ত আলোক-বিজ্ঞানে সব চেয়ে বড় দান ব'লে পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন।

আলোকরশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে নিউটন অঙ্কশাস্ত্র নিয়েও চর্চা করতেন। এই সময় তাঁর মাথায় একটা নতুন ধরনের অঙ্কের কথা এল। এটিকে অঙ্কের একটি নতুন শাখাই বলা যায়। নিউটন এর নাম দিয়েছিলেন "ফ্লাক্‌সিয়ন্‌স্‌"। আজকালকার গণিত-শাস্ত্রে 'ডিফারেন্‌শিয়াল্‌ ক্যাল্‌কুলাস্‌' বলে যে এক রকম অঙ্ক আছে আসলে এটি হচ্ছে তাই। তোমরা যদি বড় হয়ে বি. এ. কিংবা বি. এস্‌-সি. পড় তখন এই বিষয়ে একখানি মোটা বই তোমাদেরও পড়তে হবে। জানি না, যারা অঙ্ক তেমন ভালবাস না তাদের কাছে ও বই কেমন লাগবে। এও হয়তো আশ্চর্য নয়, যে, কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে ঐ অঙ্কের যিনি আবিষ্কারক তাঁর মুণ্ডপাতও করতে পার মনে মনে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি এ কথাও মনে ভাব যে এই অঙ্ক যাঁর মাথা থেকে প্রথম বেরিয়েছিল তিনি ছিলেন সদ্য বি. এ. পাশ-করা ২২।২৩ বছরের একটি ছেলে, তখন কি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় তোমাদের মাথা হেঁট হয়ে আসবে না?

ডিফারেন্‌শিয়াল ক্যাল্‌কুলাস্‌ জিনিসটি কি তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা মুশ্‌কিল; তবে এটুকু বলা যেতে পারে—আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক বড় বড় রহস্যের ঠিকমত মীমাংসা করতে হ'লে এই বিশেষ ধরনের অঙ্কটির সাহায্য না নিলে চলে না।

কিন্তু ফ্লাক্‌সিয়ন্‌স্‌-এর কথা সবার প্রথম নিউটনের মাথায় এলেও এ আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিউটন পান নি,—পেয়েছেন আর একজন জার্মান্‌ বিজ্ঞানী। নিউটনেরই সমসাময়িক তিনি, বয়সে বছর চারেকের ছোটই হবেন। তাঁর নাম লাইব্‌নিৎস্‌ (ইংরেজী উচ্চারণে লিব্‌নিট্‌জ্‌)। এর কারণ আর কিছু নয়, নিউটন এ জিনিস আবিষ্কার

করলেও তা তখনই বাইরে প্রকাশ করেন নি—নিজের কাজকর্মে এর সাহায্য নিয়েছেন মাত্র। লাইব্‌নিৎস্‌ কিন্তু তা করেন নি। নিউটনের মত তিনিও নিজের মাথা থেকেই এই নতুন ধরনের অঙ্কটি বার করেন,—অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই, এবং বার ক'রেই তা জনসমাজে প্রচার করেন। কাজেই নিউটন আগে আবিষ্কার করলেও এর কৃতিত্ব ন্যায়তঃ লাইব্‌নিৎসেরই প্রাপ্য। তা তিনি পেয়েছেনও, এবং ফ্লাক্‌সিয়ন্‌স্‌ নয়,—ডিফারেন্‌শিয়াল্‌ ক্যাল্‌কুলাস্‌ নামেই তা বিজ্ঞান-জগতে পরিচিত হয়েছে। অবশ্য এ নিয়ে নিউটনের ভক্তদের সঙ্গে লাইব্‌নিৎসের কিছু অপ্রীতিকর তর্কাতর্কিও হয়। কিন্তু সে কথা এখন নয়।

কিন্তু এই যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার—যা নাকি নিউটনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার,—তারও গোড়াপত্তন হয় এই সময়ে। সেটি হচ্ছে নিউটনের সুবিখ্যাত 'মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব'।

এ সম্বন্ধে একটা গল্প তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। সেই আপেল পড়ার গল্প। অবশ্য গল্পটি সত্যি কিনা তা নিয়েও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তবে সত্যি হওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়। বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভল্‌তেয়ার তাঁর একখানি বইএ গল্পটির প্রথম উল্লেখ করেন বলে শোনা যায়। আর উল্‌স্‌থর্পের লোকেরা তো বটেই, ইংল্যাণ্ডের লোকেরাও এ গল্প প্রায় সকলেই সত্যি বলে বিশ্বাস করে। এমন কি কিছুদিন আগেও উল্‌স্‌থর্প গ্রামে একটি আপেল গাছকে লোকে সেই বিখ্যাত গাছ বলে দেখিয়ে দিত। গাছটি অবশ্য এখন আর নেই, কিন্তু তার চিহ্ন এখনও আছে; আর আছে তার ডালপালাগুলো। সেগুলো সযত্নে কুড়িয়ে আজও রেখে দেওয়া হয়েছে—ঠিক যেমন ক'রে মিউজিয়ামে স্মৃতিচিহ্ন সাজিয়ে রাখা হয় তেমনি ভাবে।

হ্যাঁ, গল্পটাই বলা হয় নি এতক্ষণ। সেটা হচ্ছে এই: একদিন নিউটন বাড়ীর পাশে বাগানে এক আপেল গাছের তলায় বসে বসে আপন মনে কি ভাবছেন, হঠাৎ টুপ্ করে একটি আপেল ওপর থেকে খ'সে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল। ফলটি পেকে গিয়েছিল, তাই এক অসতর্ক মুহূর্তে, হয়তো হাওয়ার দোলা লেগেই, বোঁটা থেকে খ'সে যায়, তার পর মাটীতে পড়ে।

ফলটি পড়তে দেখে নিউটনের মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগল। ফলটা মাটীতে পড়ল কেন? ফলটা মাটীতে না পড়ে ওপর দিকে ছিটকে চলে যেতেও তো পারত! কিন্তু তা তো গেল না, সোজা মাটীতেই তো নেমে এল ওটা! নিউটন ভাবতে লাগলেন। যতই

ভাবতে লাগলেন ততই তাঁর মাথার মধ্যে নানা নতুন নতুন কথা, নতুন নতুন চিন্তা ভেসে আসতে লাগল। একটা ঢিলকে ওপরে



ফলটি পড়তে দেখে নিউটনের মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগল

ছুঁড়ে দিলে একটু গিয়েই আবার সেটা মাটীতেই এসে পড়ে। মাটীতে দাঁড়িয়ে লাফ দিলে, কই, শূন্যে উঠে যাওয়া যায় না তো! এমন কি, একটা হাত যদি টান ক'রে, মাটীর সঙ্গে সমান্তরাল রেখে, দাঁড়িয়ে থাকা যায় তবে খানিক পরেই হাত টন্ টন্ করে উঠবে,—যতক্ষণ না হাত নামানো যায় ততক্ষণ স্বস্তি পাওয়া যাবে না। এ কি অদ্ভুত—আশ্চর্য আকর্ষণে মাটী আমাদের অহরহঃ টানছে! সব কিছুকেই টানছে! এ কি দুর্বার শক্তি তার! যতই ভাবতে লাগলেন ততই তাঁর মাথা যেন ঘুলিয়ে যেতে লাগল। এ সমস্যার সমাধান তাঁকে বার করতেই হবে।

এখানে আমাদের এক মাস্টার মশাইয়ের গল্প মনে পড়ছে নিউটনের এই গল্পটি পড়াচ্ছিলেন তিনি। পড়াতে পড়াতে বললেন, "কী রকম বোকা ছিল দেখ্ নিউটন! পাকা আপেলটা গাছ থেইকে টুপ্ কইরে পইড়ল, তুইলে খেইয়ে নে; তা না—কেন পইড়ল, কোথায় পইড়ল, উপরে না উঠে নীচে পইড়ল কেন—সবের জবাব দেও ওকে! আহাম্মুক আর কাকে বলে?" মাস্টার মশাই অবশ্য ঠাট্টাচ্ছলেই ও কথা বলেছিলেন, কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ লোকেরই তো ঐ রকম মত! পাকা আপেলটি পেলে আগে সেটি তুলে তার আস্বাদ গ্রহণ করতেই লোকে ব্যস্ত হয়, সৃষ্টির কি গভীর রহস্য যে ঐ ছোট্ট ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে উদ্ঘাটিত হতে পারে তা কি কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে?

কিন্তু এই রকমটাই হয়। আপেল পড়ার কাহিনী সত্যি হোক আর নাই হোক, এই রকম ছোট্ট এক একটি ঘটনা নিয়েই জগতের অনেক মহাসত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। নিউটনও হয়তো তাই করেছিলেন। তবে শুধু ঐটুকুই সব ভাবলে একেবারেই ভুল করা হবে। হয়তো ঐ থেকে কথাটা তাঁর মনে প্রথম এসে থাকবে; কিন্তু ওর পেছনে যে কত নিদারুণ পরিশ্রম, কত বিনিদ্র রজনী, কত দুরূহ হিসাবপত্র আর গভীর চিন্তা ব্যয় করতে হয়েছিল তাঁকে—সে কথাও ভুললে চলবে না।

নিউটন ভাবতে লাগলেন, পৃথিবীর এই আকর্ষণ যদি সত্যি হয় তবে সে আকর্ষণ—সে শক্তি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে? এই যে আকাশ-যোড়া গ্রহনক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, উল্কাপিণ্ড—সবের মধ্যেই কি সেই এক আকর্ষণ?

ছেলেবেলা থেকেই গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে নানা খবর জানবার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল নিউটনের। এজন্য তিনি শুধু কেপ্লার, গ্যালিলিও প্রভৃতি বড় বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর লেখাই পড়েন নি, নিজেও রাত জেগে গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন। চাঁদের

গতিবিধি সম্বন্ধে তাঁর বেশ ভাল রকম জ্ঞান ছিল। তিনি ভাবতে লাগলেন—এ যদি সত্যি হয় তবে চাঁদ যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে এও পৃথিবীরই টানে! পৃথিবী না টানলে চাঁদ সোজা ছিট্‌কে বেরিয়ে যেত, পৃথিবীই তাকে টেনে রেখেছে। ফলে দুই টানে পড়ে চাঁদ ক্রমাগত ঘুরছে আর ঘুরছে আর ঘুরছে। একটা দড়ির মাথায় ঢিল বেঁধে যদি তা চক্রাকারে ঘোরানো যায় তা হলে যেমন হয় এও যেন ঠিক তাই। চাঁদের বেলা যদি এ কথা সত্যি হয় তবে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ, সমস্ত জ্যোতিষ্ক পদার্থ সম্বন্ধেই তা খাটবে। ইতিপূর্বে কেপ্‌লার গ্রহদের গতিবিধি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করে যে নিয়ম—যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন নিউটন তা কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন এবং লাগালেনও। গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত তথ্য—যা নাকি প্রত্যেক পতনশীল পদার্থের ওপর একভাবে কাজ করছে সেটাও তাঁকে প্রচুর সাহায্য করল।

কি আবিষ্কার করলেন নিউটন? এক কথায়, কোন্ মহাশক্তির আকর্ষণে—কোন্ অলিখিত নিয়মে গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী—আকাশের যাবতীয় জ্যোতিষ্ক পদার্থ তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভ্রমণ-পথে এক নির্দিষ্ট নিয়মে চলাফেরা করছে তারই সূত্র বার করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে—এই মহাসত্যও উদ্ঘাটিত হ'ল তাঁর কাছে। এই আকর্ষণের মধ্যেও একটা নিয়ম আছে। আকর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে দু'টি জিনিসের দূরত্ব ও বস্তুভর—ইংরেজীতে যাকে বলে 'মাস্'—তার ওপরে। যে পদার্থের বস্তুভর বেশী সেটি কম বস্তুভর-যুক্ত পদার্থকে বেশী জোরে টানবে তার কেন্দ্রের দিকে। ঠিক এই রকম, কাছের জিনিসের ওপরেও পদার্থের টান দূরের জিনিসের চাইতে বেশী হবে। সোজা কথায়—একটি বড় আর একটি ছোট জিনিসের মধ্যে টানাটানির সময় বড় জিনিসটি ছোটটিকে বেশী জোরে টানবে, তেমনি দূরের জিনিসের চাইতেও কাছের জিনিসের ওপর

টানটা বেশী হবে। এই কারণেই আপেল মাটীতে পড়ে। পৃথিবীর তুলনায় আপেল অনেক—অনেক ছোট। আপেলও, যদিও, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে তার দিকে টানছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় তার টান নগণ্য। তাই আপেলকে পৃথিবীর ওপর দ্রুত নেমে আসতে হচ্ছে। নিউটন নানারকম আঁকজোঁক কষে—দুরূহ এই সব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করলেন। একেবারে অঙ্কশাস্ত্র-অনুমোদিত নিয়ম—যার আর নড়চড় নেই। "নিউটনের নিয়ম" নামে তা বিজ্ঞানের খাতায় সোনার অক্ষরে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

কিন্তু এই আবিষ্কার—এই নিয়ম তৈরী একদিনে সম্ভব হয় নি। বহুদিন পরে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সমর্থ হন। বরঞ্চ এক সময়ে তিনি এ নিয়ে এমন ঘা খেয়েছিলেন যে সব কিছু ভুল, সব কিছু ত্রুটীপূর্ণ ব'লেও তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল। ব্যাপারটা তা হ'লে আর একটু খুলে বলি।

নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে গবেষণা সুরু করেন তখন, আগেই বলেছি, তাঁর বয়স মাত্র ২২।২৩ বছর। যে মহাসত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন অঙ্ক কষে তিনি যখন তা প্রমাণ করতে গেলেন তখনই পড়ল বাধা। আগেই বলেছি, নিউটন এই প্রমাণের জন্য চন্দ্রের গতিবিধি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। পৃথিবীর আকর্ষণই যদি চাঁদের ঘুরবার কারণ হয় তা হ'লে, তাঁর হিসেবমত, চাঁদের প্রতি মিনিটে পৃথিবীর দিকে ১৬ ফুট করে ঝুঁকে পড়বার কথা। কিন্তু যতবারই অঙ্ক কষেন, দেখেন, কই, ১৬ ফুট তো নয়, ১৩ ফুটের মাত্র সামান্য একটু বেশী হচ্ছে! নিউটন ভাবলেন, নিশ্চয়ই তাঁর আবিষ্কারের কোথাও কোনও গলদ আছে, সমস্ত ধারণাটাও তাঁর ভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। সমস্ত কাগজপত্র সেইখানে চাপা দিয়ে তিনি তখনকার মত ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো একেবারেই ছেড়ে দিলেন। এইভাবে বিজ্ঞানের এক মহাসত্য অনির্দিষ্ট ভাবে বাক্সের তলায় চাপা পড়ে রইল—দীর্ঘ দিনের জন্য।

এর প্রায় ১৬ বছর পরে, ১৬৮২ সালে, ফ্রান্সে পিকার্দ নামে একজন বিজ্ঞানী পৃথিবীর ব্যাস এবং পারধি সম্বন্ধে একটা নতুন তথ্য পরিবেশন করলেন। পিকার্দ দেখালেন, পৃথিবীর ব্যাস আর পরিধি সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সব হিসেবপত্র করা হয়েছে তার মধ্যে কিছু কিছু ভুল-ক্রটী আছে। সেগুলি সংশোধন করলে দেখা যাবে পৃথিবীর ব্যাস আরও একটু বেশী হবে। খবরটা নিউটনের কানে যেতেই তাঁর মাথায় চন্ করে উঠল। বহুদিনের চাপা-দিয়ে-রাখা মাধ্যাকর্ষণের সেই হিসেবপত্রের কথা মনে পড়ল তাঁর। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি দ্রুতহস্তে বসে গেলেন আবার সেই কাগজপত্র আর কলম নিয়ে। দেখতে দেখতে তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, সমস্ত শরীরে যেন শিহরণ খেলে গেল। নির্ভুল—নির্ভুল! তাঁর ধারণা নির্ভুল! এই তো চাঁদ প্রতি মিনিটে ঠিক ১৬ ফুট করে ঝুঁকে পড়ছে পৃথিবীর দিকে। অঙ্ক ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে!

মাধ্যাকর্ষণের মহারহস্য নির্ভুল ভাবে ধরা পড়ে গেল সেদিন নিউটনের কাছে। এই ভাবে লক্ষ কোটি মাইল দূরে বসে একটি ছোট্ট মানুষ গ্রহ-উপগ্রহের ঘরের কথা টেনে বার করে আন্‌ল।—কি ভাবে তারা আকাশে রয়েছে, কেন তারা ঐ ভাবে ঘুরছে ইত্যাদি। সেই সঙ্গে এও প্রমাণ করে দিল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি পদার্থ—বিরাট সূর্য থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীর বুকের ছোট্ট একটি ধূলিকণা পর্যন্ত,—সবাই এক অলঙ্ঘ্য মহানিয়মের সূত্রে বাঁধা।

নিউটনের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কথা এখানে বলা দরকার। নিউটনের আগে গ্যালিলিও দূরবীণ আবিষ্কার ক'রে গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নিউটন লক্ষ্য করলেন, পুরোনো ধরণের দূরবীণে ঠিক মনের মত কাজ পাওয়া যায় না। দূরবীণের একটি লেন্সের ওপর দ্রষ্টব্য পদার্থের ছবি কেমন যেন একটু ঝাপসা হয়ে যায়। এই ক্রটী দূর করা যায় কি ক'রে

দূরবীণ তৈরীর ব্যাপারে আলোর প্রতিসরণ ব্যাপারটাকে কাজে না লাগিয়ে যদি আলোর প্রতিফলন ব্যাপারটাকে কাজে লাগানো যায় তা হ'লে হয়তো এ ব্যাপারের একটা সুরাহা হতে পারে।

ছেলেবেলা থেকেই কারিগরি কাজে নিউটন অত্যন্ত পটু। তাঁর কাছে এ কাজ খুব কঠিন মনে হ'ল না। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ঐ রকম নতুন ধরনের একটি ছোট দূরবীণ বানিয়ে ফেললেন। মাত্র ছ' ইঞ্চি লম্বা, আর এক ইঞ্চি তার ব্যাস। ভিতরে ছোট্ট একটি আয়না বসানো। কিন্তু এই দূরবীণ দিয়েই দূরের জিনিসকে চল্লিশ গুণ বড় দেখাতে লাগল। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট ধরা পড়ল এই দূরবীণে।

কাজে সাফল্য লাভ করে নিউটন আরও একটি ঐ রকম দূরবীণ তৈরীর কাজে লেগে গেলেন। এবারেরটি আরও ভাল ক'রে এবং আরও নিখুঁত ক'রে তৈরী করা হ'ল। তখনকার দিনে অমন ভাল দূরবীণ পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। চারদিকে নিউটনের জয়জয়কার।

নিউটনের নিজের হাতে তৈরী সেই দূরবীণটি আজও লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির লাইব্রেরী-ঘরে সাজান আছে। তোমরা যদি কখনও সেখানে যাও ওটি দেখে আসতে ভুল না।

নিউটন নতুন ধরনের দূরবীণ আবিষ্কার করলেন, কিন্তু সেই সূত্রে আরও একটা আবিষ্কার করে বসলেন যেটা নাকি তাঁর মতে ঢের ঢের বড় আবিষ্কার। কারণ প্রথমটি হচ্ছে কেবল একটি যন্ত্র তৈরী, কিন্তু দ্বিতীয়টির মধ্যে রয়েছে নতুন তথ্য—যা থেকে নতুন সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এবং হ'লও তাই।

নিউটন দূরবীণ তৈরী করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, দূরবীণের লেন্সের গায়ে রামধনুর মত সাতটি রঙের এক সাত-রঙা ছায়া পড়ছে। এই ব্যাপার নিয়ে তখন তাঁর পরীক্ষা ও গবেষণা চলল। ফলে রং আর আলোর রহস্য নিয়ে অনেক নতুন নতুন সত্য তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন।

এবারে আবার আমরা নিউটনের কেম্ব্রিজের জীবনে ফিরে আসব।

১৬৬৭ সালে প্লেগের উপদ্রব একটু কমে এল। স্কুল-কলেজ আবার খুলল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও আবার রীতিমত পড়াশোনা চলতে লাগল। নিউটনও উল্‌স্‌থর্প থেকে ফের চলে এলেন কেম্ব্রিজে।

নিউটন ছিলেন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র। এই সময় সেখানে নতুন করে ৯ জন ফেলো নির্বাচন করা হচ্ছিল। নিউটনও একজন প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনে তাঁকে জুনিয়র ফেলোর পদে গ্রহণ করা হ'ল। ফলে, থাকবার আর কলেজে কাজকর্ম করবার ভারী সুযোগ-সুবিধা জুটে গেল তাঁর। দেখতে দেখতে তিনি জুনিয়র থেকে সিনিয়র ফেলোর পদে উঠে গেলেন এবং তার পরেই এম্. এ. ডিগ্রী পেয়ে গেলেন। পণ্ডিত ব'লে দেখতে দেখতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অঙ্কশাস্ত্রের ওপর কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধও লিখে ফেললেন তিনি।

১৬৬৯ সালে নিউটনের ভাগ্যদেবী আরও সদয় হলেন তাঁর ওপর। ঐ বছর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত লিউকেসিয়ান অধ্যাপকের পদ নতুন করে খালি হ'ল এবং সে পদে নিউটনই বহাল হলেন। এর আগে ঐ অধ্যাপকের পদটিতে ছিলেন ডক্টর ব্যারো। কেউ কেউ বলেন, ডক্টর ব্যারো ঐ পদটি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন—যাতে নিউটন ঐ পদ পান। নিউটনকে তিনি অসম্ভব স্নেহ করতেন। বলতেন, "এ পদের যোগ্য লোক আমি নই,—নিউটনেরই এ পদে বসা উচিত।"

এ রকম মহানুভব শিক্ষক, ছাত্রের প্রতি এমন দরদী শিক্ষক সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না

লিউকেসিয়ান অধ্যাপক হওয়ার পর থেকে নানা দিক্ দিয়ে নিউটনের সুদিন এল। কলেজে তাঁকে অল্পক্ষণই কাজ করতে হ'ত। বক্তৃতা যা দিতে হ'ত তাও সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেমত বিষয়ের ওপর। মাইনেও ছিল বেশ মোটা। নিউটন মনের আনন্দে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। লণ্ডনের বিখ্যাত বিজ্ঞান-সভা রয়্যাল সোসাইটি থেকে তাঁকে সদস্য-তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হ'ল। এটিও বিজ্ঞানীর পক্ষে খুব সম্মানিত পদ।

এই সময়ে নিউটনের প্রতিভা নানা দিকে বিকাশ লাভ করে। আলো আর রং নিয়ে তো আগে থেকেই তিনি গবেষণা করছিলেন, বিদ্যুৎ নিয়েও তিনি গবেষণা সুরু করলেন। ঘষাঘষির ফলে যে বিদ্যুৎ-শক্তির সৃষ্টি হয়—ইংরেজীতে যাকে বলে 'ফ্রিক্শনাল্ ইলেকট্রিসিটি'—তাই ছিল তাঁর পরীক্ষার বিষয়। তোমরা লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, একটা কাচের রড্ বা ডাণ্ডাকে যদি রেশমী বা পশমী কাপড় দিয়ে ঘষা যায় আর তার কাছে কিছু ছেঁড়া কাগজের কুচি রাখা যায়, তাহ'লে ঐ কাগজের কুচিগুলো আপনা থেকে ছুটে এসে কাচের রডে গিয়ে পড়ে। চুম্বক লোহার সামনে লোহার গুঁড়ো রাখলে সে চুম্বক যেমন লোহার গুঁড়োগুলোকে আকর্ষণ করে এও অনেকটা সেই রকম। তবে কাগজের কুচিগুলি বেশীক্ষণ কাচের রডের গায়ে আটকে থাকে না, অল্প পরেই আবার পড়ে যায়। নিউটনও এই রকম পরীক্ষা করেছিলেন। তবে কাচের রড্ নিয়ে নয়—পুরু কাচের পাত (১২" × ⅛") নিয়ে। কিন্তু পরীক্ষা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। এর কারণও তিনি বার করেছিলেন। কারণটা আর কিছু না, কাচের পাতে রেশমী কাপড় ঘষার ফলে সেখানে ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ (ফ্রিক্শনাল ইলেক্ট্রিসিটি) তৈরী হয়। আর তারই ফলে তা কাগজের কুচি-গুলিকে আকর্ষণ করে। কাচের গায়ে লাগার পর আবার সেই কাগজগুলি নীচে ঠিকরে পড়ে, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে বিকর্ষণ। অর্থাৎ আকর্ষণের উল্টো। নিউটন এই পরীক্ষা থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি

সম্বন্ধে কতগুলি তত্ত্ব বার করলেন। পদার্থের মধ্যে পরমাণুগুলি কি ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে সে সম্পর্কেও একটা আভাস দিলেন।

কেমিস্ট্রি অর্থাৎ রসায়ন বিজ্ঞান নিয়েও তিনি কিছুটা কাজ করেছিলেন। তবে তা তেমন উল্লেখযোগ্য বলা চলে না।

ক্যাল্‌কুলাসের আবিষ্কার সম্পর্কে নিউটনের সঙ্গে জার্মান্ বিজ্ঞানী লাইব্‌নিৎসের নাম আগেই করেছি। এঁরা প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং দু' রাজ্যের হলেও পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু গোল বাধল যখন লাইব্‌নিৎস্ তাঁর 'ক্যাল্‌কুলাস্' আবিষ্কার-কাহিনী বিশ্বজগতের সামনে প্রকাশ করলেন।

বলা বাহুল্য এত বড় একটা আবিষ্কার যে দেশের লোক করবেন পৃথিবীর পণ্ডিত-মহলে সে দেশের খাতির অনেক বেড়ে যাবে। নিউটন অবশ্য এর অনেক আগেই ঐ অঙ্ক আবিষ্কার করেছিলেন ফ্লাক্‌সিয়ন্‌স্ নাম দিয়ে, কিন্তু সে কথা তো তিনি বাইরে কারও কাছে প্রকাশ করেন নি! শুধু নিজের কাজে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র! লাইব্‌নিৎসের পক্ষে তা জানার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং বস্তুতঃ তিনি বোধ হয় তা জানতেনও না। তাঁর মত প্রতিভাশালী পণ্ডিতের কাছে নিজের মাথা থেকে ঐ অঙ্ক বার করা এমন কিছু কঠিন বা অসম্ভব ব্যাপার নয়, এবং মনে হয় সত্যিই তিনি সম্পূর্ণ নিজের প্রতিভায় ও-জিনিস আবিষ্কার করেন। কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কারের গৌরব জার্মানীতে চলে যাচ্ছে দেখে নিউটনের একদল ভক্ত মাথা ঠিক রাখতে পারল না। তারা বলে বেড়াতে লাগল— লাইব্‌নিৎস্ ও-জিনিস নিজে বার করেন নি, নিউটনের আবিষ্কারই তিনি কোনও সূত্রে জেনে এখন নিজের নামে চালাচ্ছেন। এ অপবাদ লাইব্‌নিৎস্ মেনে নেবেন কেন? তিনিও দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ জানালেন। নিউটন অবশ্য লাইব্‌নিৎসের প্রতিভা স্বীকার করতেন, কিন্তু তবু এ ব্যাপারে যতটা জোরের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের তাঁর বাধা

দেওয়া উচিত ছিল তা তিনি দেন নি। ফলে পণ্ডিত-মহলে একটা বিশ্রী মতবিরোধের সৃষ্টি হয়—যা নিউটনের পক্ষে খুব গৌরবের কথা নয়।

এই রকম ব্যাপার আরও হয়েছিল। হুক্ নামে আর একজন বড় বিজ্ঞানী ছিলেন সে সময়ে ইংল্যাণ্ডে। তিনিও ছিলেন রয়্যাল সোসাইটির সদস্য। কোন কোন আবিষ্কারের দাবী নিয়ে তাঁর সঙ্গেও নিউটনের খুব বিরোধ দেখা দেয়। তবে এ ক্ষেত্রে, যতটা জানা যায়, হুক্ সাহেবেরই ছিল বেশী দোষ। নিউটনের অনেক আবিষ্কার তিনি নিজের বলে দাবী করেন। নিউটন অবশ্য তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবেই তর্কযুদ্ধে নামেন—এবং দীর্ঘ দিন ধরে এ নিয়ে তর্কাতর্কি, বাক্‌বিতণ্ডা এবং মনোমালিন্য চলে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিউটনেরই জয় হয়েছিল এবং ন্যায়তঃ সেটা ঠিকই হয়েছিল।

মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের পর আরও দু' বছর পর্যন্ত নিউটন ঐ ব্যাপার নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। হয়তো ঐ আবিষ্কার আরও নিখুঁত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। যাই হোক, অবশেষে তিনি তাঁর আবিষ্কার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া' নামে বিখ্যাত গ্রন্থে।

প্রিন্সিপিয়া লেখা হ'ল। এমন উঁচুদরের বই বিজ্ঞানের ইতিহাসে কমই লেখা হয়েছে। কিন্তু বই ছাপিয়ে বার করার কোন গরজই নেই নিউটনের। এমন কি রয়্যাল সোসাইটির মত বড় বিজ্ঞান-সভার সদস্য হয়েও তিনি সেখানে এ বই লেখা সম্বন্ধে কোন কথাই বললেন না, কাউকে জানালেন না পর্যন্ত! বই লিখে, বাক্সবন্দী করে, আবার তিনি অন্য কাজে মন দিলেন। কেন অমন করলেন তার অবশ্য একটা কারণ ছিল। এর ঠিক আগে তিনি আলো আর রং সম্পর্কে তাঁর গবেষণা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি নিয়ে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে খুব আন্দোলন হয়। একদল যদিও তাঁর মতে সায় দেন, কিন্তু অপর দল এর

তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা নিউটনের ধারণাকে একদম ভুল এবং বাজে বলে নস্যাৎ করে দিতে চেষ্টা করেন। নিউটনও তাঁদের সঙ্গে তর্কাতর্কি সুরু করেন। এতে অন্য ফল যাই হোক, নিউটনের কয়েকজন শত্রু সৃষ্টি হয়। প্রিন্সিপিয়া লেখার পরও সম্ভবতঃ ঐ রকম গণ্ডগোল হতে পারে আশঙ্কা ক'রে নিউটন ওটার কথা আর তখন কাউকে বললেন না।

কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রিন্সিপিয়া এর পরেই বেরিয়ে গেল। এ জন্য প্রধান কৃতিত্ব অবশ্য নিউটনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হ্যালির।

হ্যালিও মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর দানও বড় কম নয়। তার ওপর তিনি ছিলেন নিউটনের পরম ভক্ত।

জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে করতে এক জায়গায় এসে হ্যালি ভীষণ ভাবে আটকে গেলেন। গ্রহের গতিপথ নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি, কিন্তু একটা জায়গায় প্রমাণের অভাবে কাজ এগুচ্ছিল না। অথচ সে সময়ে ইংল্যাণ্ডে এমন কেউ ছিল না যে তাঁর সমস্যার সমাধান ক'রে দিতে পারে। অবশেষে তিনি একদিন এসে নিউটনকে ধরলেন।

সমস্যা দেখে নিউটন তো খুব খুশী। বললেন, "আরে, আমি যে এই নিয়ে দু'বছরের ওপর কাজ করেছি, আর এ তো আমি অঙ্ক কষেই বার করে ফেলেছি! তুমি যা ভেবেছ ঠিকই ভেবেছ। এই দেখ, আমি অঙ্ক কষে তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি।"

প্রিন্সিপিয়া খুলে মুহূর্তমধ্যে হ্যালির সমস্যার সমাধান করে দিলেন নিউটন। আর সেই সময় হ্যালিও দেখলেন নিউটনের প্রিন্সিপিয়ার পাণ্ডুলিপি। অবাক্ কাণ্ড! এ রকম বই কেউ লিখতে পারে? আবার যদি কেউ লেখেই, কেউ কি তা না ছাপিয়ে ফেলে রাখে? এ যে সোনার খনি!

হ্যালি বললেন, "আমি তোমার প্রিন্সিপিয়ার পাণ্ডুলিপি নিয়ে চললাম। এ বই ছেপে বার না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।"

হ্যালি প্রথমে চলে এলেন রয়্যাল সোসাইটিতে, সমিতির কর্তাদের অনুরোধ করলেন বইটা ছাপতে। তাঁরা একটু ইতস্ততঃ করে প্রথমটা রাজী হলেন, তারপরই আবার কি মনে ক'রে, টাকার বড় টানাটানি যাচ্ছে এই ওজুহাত দেখিয়ে, বইখানা ফেরৎ দিলেন। রেগেমেগে হ্যালি বললেন, "বেশ, আমিই ছাপব এ বই। নিজের পয়সা খরচ করে ছাপব। দরকার নেই তোমাদের দয়ার।"

তাই করলেন হ্যালি। নিজের টাকা দিয়েই নিউটনের বই ছাপলেন তিনি। যদিও তাঁর আয় তখন ছিল সামান্যই। নিউটনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর বিজ্ঞানের প্রতি গভীর দরদ—এরই জন্য এটা সম্ভব হ'ল।

কিন্তু হ্যালি ঠকলেন না। বই বেরোনো মাত্র চারদিকে যেন একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। হু-হু করে কাটতে লাগল বই। হ্যালি যে টাকা ঢেলেছিলেন তার সবই ফেরৎ পেলেন অল্প দিনের মধ্যেই। মাঝের থেকে কাণ্ড দেখে রয়্যাল সোসাইটিই বোকা ব'নে গেল।

এবার হুকের পালা। হুক্ বিজ্ঞানী হিসাবে অনেক ভাল ভাল কাজ করেছিলেন ঠিকই, আর লোকটিও ছিলেন পণ্ডিতই, তাই ব'লে নিউটনের প্রতিভা তিনি কোথায় পাবেন? তার ওপর লোকটিও তিনি তেমন সুবিধের ছিলেন না। কারণে অকারণে লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে বাধত না তাঁর। প্রিন্সিপিয়া বার হতে না হতে হুক্ মহা গণ্ডগোল সুরু ক'রে দিলেন, বললেন, এর অনেকগুলি আবিষ্কার নাকি তিনিই আগে করেছিলেন, নিউটন সেগুলো বেমালুম নিজের ব'লে চালিয়েছেন। এ অন্যায়—অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। প্রিন্সিপিয়ায় হুকেরও নাম দিতে হবে,—তাঁর ঋণ স্বীকার করতে হবে নিউটনকে।

বলা বাহুল্য কথাগুলি একেবারেই ঠিক নয়। হুক্ হয়তো ও সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ করে থাকবেনও বা, কিন্তু তার কথা তিনি কখনও প্রকাশ করেন নি, লোকেও জানে না, নিউটন তো ন'নই।

তা ছাড়া এ সব আবিষ্কার নিউটনের বহুদিনের বহু পরিশ্রমের ফল। যুগান্তকারী আবিষ্কার বলা যেতে পারে এগুলিকে। নিউটন তাই তীব্র প্রতিবাদ জানালেন হুকের ঐ দাবীর বিরুদ্ধে। হ্যালি প্রভৃতি বন্ধুরাও তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেন। ওদিকে হুক্ কিছুদিন খুব আস্ফালন ক'রে তারপর চুপ করলেন। তাঁর দিক্ থেকে দেখাবার মত যেমন প্রমাণও ছিল না, সমর্থকের সংখ্যাও তেমনি ছিল কম। যাই হোক্, দুই বড় বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই রকম ঝগড়া আর পরস্পরবিরোধী দাবী জগতের বিদ্বজ্জনের সামনে ইংল্যাণ্ডের সুনাম নিশ্চয়ই বাড়ায় নি।

প্রিন্সিপিয়া নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যতটা তোলপাড় হ'ল ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে প্রথম প্রথম সে রকমটা হয় নি। তার কারণ বোধ হয় লাইব্‌নিৎসের সঙ্গে নিউটনের ক্যাল্‌কুলাস্ আবিষ্কারের দাবী নিয়ে মতবিরোধ। অন্যান্য দেশের লোকেরা ও-ব্যাপারে লাইব্‌নিৎসেরই পক্ষ নিয়েছিল, নিউটনকে তারা তাই একটু খারাপ চোখেই হয়তো দেখতো। 'প্রিন্সিপিয়া'র মত বই পেয়েও তাই তারা হয়তো যাচাই না ক'রে লুফে নিতে রাজী হয় নি। পরে অবশ্য তারা সকলেই নিউটনের প্রতিভা স্বীকার করেছিল, এবং একবাক্যেই।

ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে, দেশে ধীরে ধীরে অনেকটা শান্তিও ফিরে এসেছে। এমন সময় ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসলেন দ্বিতীয় জেমস্। এই সময় ইংল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ অবস্থাপন্ন লোকই ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী, আর ঐ প্রোটেস্ট্যান্ট মতকেই সব ব্যাপারে প্রাধান্য দেওয়া হ'ত। কিন্তু দ্বিতীয় জেম্স্ ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক—প্রোটেস্ট্যান্টদের যারা দু'চোখে দেখতে পারত না। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে প্রোটেস্ট্যান্ট আর রোমান ক্যাথলিকদের এই ঝগড়ার কথা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ?

জেম্স্ রাজা হয়ে সমস্ত ব্যাপারে ওলটপালট সুরু করে দিলেন। এমন কি দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরেও তিনি হামলা সুরু করলেন। যে সব জায়গায় প্রোটেস্ট্যান্ট মত মেনে চলা হ'ত সেগুলোর ওপর তাঁর আক্রোশটা যেন একটু বেশী দেখা যেতে লাগল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ও এর হাত থেকে ছাড়া পেল না।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন নিয়ম ছিল—নতুন ছাত্রদের ভর্তি হবার সময়ে প্রোটেস্ট্যান্ট প্রথায় শপথ ক'রে ভর্তি হতে হবে। রাজা জেম্স্, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের জব্দ করার উদ্দেশ্য নিয়েই, একজন রোমান ক্যাথলিক ছাত্রকে কেম্ব্রিজে পাঠিয়ে দিলেন। আর সেই সঙ্গে হুকুম দিলেন ওর বেলায় যেন প্রোটেস্ট্যান্ট প্রথায় শপথ নেবার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

হলেনই বা রাজা, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ও তো আর হেলাফেলার প্রতিষ্ঠান নয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা স্থির করলেন—এ আদেশ অন্যায়। এ মাথা পেতে নেওয়া হবে না কিছুতেই। তাঁরা এর তীব্র প্রতিবাদ ক'রে একটা প্রতিনিধি দল খাড়া করলেন। ঠিক হ'ল, এই দল গিয়ে শিক্ষা-বিভাগের সর্বোচ্চ পরিষদে তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন। নিউটনকেও এই প্রতিনিধি দলে নেওয়া হ'ল।

শিক্ষাপরিষদ্ সমস্ত আইন জেনেশুনেও রাজাকে খুশী করতে চাইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বরখাস্ত ক'রে দিল তারা। প্রতিনিধিরা ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু তাঁদের মনে বলসঞ্চার করলেন বৈজ্ঞানিক নিউটন। বক্তা হিসেবে তিনি কিছুই ন'ন, কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধিতে তিনি অসামান্য। তিনি বললেন, "খবরদার, কেউ মাথা হেঁট ক'রে যা বলে তা মেনে নেবে না। আইন আমাদের পক্ষে। আমরা জিতবই।"

নিউটনের কথায় আর সবাইও যেন সাহস পেলেন। অন্যায় আদেশ কিছুতেই মেনে নিলেন না তাঁরা।

রাজার বিরুদ্ধে সমস্ত দলকে উস্কানো! নিউটনের অদৃষ্টে রাজরোষ কি অনর্থ বাধাত কে জানে, কিন্তু এই সময় ইংল্যাণ্ডে আবার একটা রাষ্ট্রবিপ্লব গোছের দেখা দিল, যার ফলে জেম্স্কে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে হ'ল; আর হল্যাণ্ড থেকে প্রিন্স উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জকে এনে বসানো হ'ল ইংল্যাণ্ডের রাজ-সিংহাসনে। ফলে নিউটনের তো কোন বিপদ্ হ'লই না, উপরন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একেবারে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক নিউটন শেষে হলেন কিনা রাজনীতিক!

রাজনীতিক হিসাবে নিউটন পার্লামেন্টে এসে আর কি করবেন? সেটা তো আর সত্যি তাঁর উপযুক্ত স্থান নয়! তবু খেয়ালের বশে এসে পড়লেন তিনি। এতে সুবিধার মধ্যে এই হ'ল যে কিছু পদস্থ লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল তাঁর।

আরও একটা সুবিধা হ'ল—যার জন্য বাকি জীবনটা নিউটন এক রকম নিরুদ্বেগেই কাটাতে পেরেছিলেন। অবশ্য আর্থিক দিক্ দিয়েই কথাটা বলছি।

প্রথম যখন নিউটন পার্লামেন্টে ঢোকেন তখন তিনি ছিলেন বিরোধী দলে। পরে তাঁদের দলই পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব দখল করে।

যিনি ছিলেন দলের পাণ্ডা তিনি আবার নিউটনেরও ছিলেন পরম বন্ধু। নিউটনের আর্থিক অবস্থা তখন ভাল যাচ্ছিল না। একটা বড় গোছের সরকারী চাকরি পেলে যে তাঁর খুব সুবিধা হয় এ কথা তিনি কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুকে জানানোয় বন্ধু তাঁকে লণ্ডনের টাঁকশালের বড়কর্তার (মাস্টার অব্ দি মিন্ট) পদে বহাল করিয়ে দিলেন। খুব মোটা মাইনের চাকরি, কাজও এমন কিছু নয়। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন নিউটন।

চাকরি পেলেন বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাধনা তখনও চলতে লাগল তাঁর। তবে আগের মত নয়। বলতে কি, নিউটনের যা কিছু বড় বড় আবিষ্কার সবই প্রায় তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে হয়ে গিয়েছিল। এর পরে যে তিনি আর বিজ্ঞানের চর্চা করেন নি তা নয়, কিন্তু অমন যুগান্তকারী আবিষ্কার আর তিনি করতে পারেন নি।

এর ওপর আবার দেখা দিল এক নতুন জ্বালা। নিউটনের বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ পূর্ণ হতে চলেছে। হঠাৎ তাঁর মধ্যে কেমন একটা মানসিক দৌর্বল্য দেখা দিল। সর্বদাই কেমন একটা বিমর্ষ ভাব! তবে কি এ মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ? নিউটন কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবেন? এত বড় একটা মাথা—তারও কি শেষ পর্যন্ত এই পরিণাম?

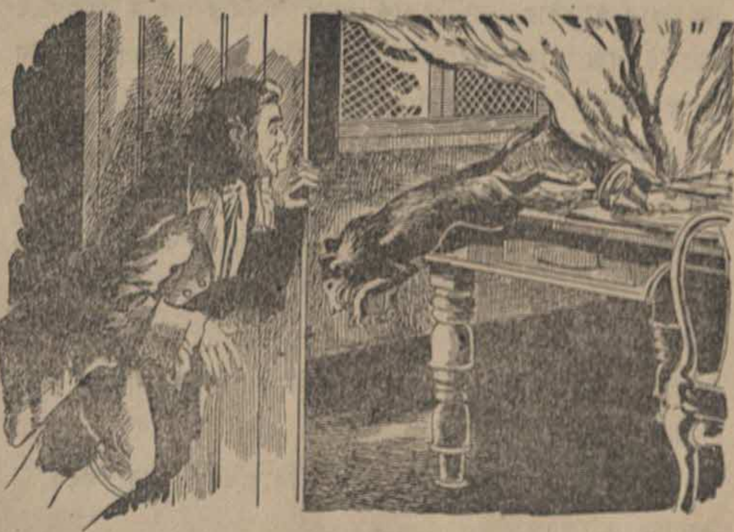
স্যামুয়েল পেপিস্ নামে এক ভদ্রলোককে লেখা নিউটনের এই সময়কার একখানা চিঠি দেখলে সত্যিই ঐ সব কথা মনে হয়। অত্যন্ত অসংলগ্ন তার ভাষা, তেমনি অসংলগ্ন তার বিষয়বস্তু। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কখনও অমন চিঠি লিখতে পারে না।

কিন্তু এমনটা হবার কারণ কি? শোনা যায় তাঁর একটা পোষা কুকুর এর জন্য অনেকটা দায়ী। নিউটন এই কুকুরটিকে খুব ভালবাসতেন। আদর করে ডাকতেন—ডায়মণ্ড।

কিন্তু এই ডায়মণ্ডই একদিন বিভ্রাট বাধাল।

একদিন রাত্রে নিউটন টেবিলের ধারে ব'সে কাজ করছিলেন। টেবিলের ওপর ছিল স্তূপাকার কাগজ। তাঁর বহুদিনের বহু গবেষণার ফলাফল লেখা ছিল ঐ সব কাগজে। মোটা মোটা অঙ্কে ভরা ছিল ওর অনেক পাতা। একটা মোমবাতি জ্বলছিল টেবিলের ওপর, আর পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল আদরের কুকুর ডায়মণ্ড।

হঠাৎ কি একটা কাজে নিউটন উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। আর যেই নিউটন দরজা পার হয়েছেন, ডায়মণ্ডও এক লাফে তাঁর টেবিলে গিয়ে হাজির। টেবিলে সে কি দেখেছিল কে জানে, কিন্তু ঐতেই হ'ল কাল। ডায়মণ্ডের লেজের ধাক্কা লেগে জ্বলন্ত মোমবাতিটা উল্টে গেল, আর পড়বি তো পড় সেই কাগজগুলির ওপরে।



নিউটন তখনই ছুটে এলেন, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে

কাগজ পোড়ার উগ্র গন্ধে নিউটন তখনই ছুটে এলেন, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। মোমবাতির আগুনে তাঁর কুড়ি

বছরের সঞ্চিত যাবতীয় গবেষণার ফল পুড়ে একবারে ছাই হয়ে গেছে। হাজার মাথা খুঁড়লেও আর তা ফিরে পাবার কোন উপায় নেই।

বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন নিউটন। কার ওপর রাগ করবেন? ঐ মূক প্রাণী? ও কেমন করে বুঝবে কী অঘটনই না ও ঘটিয়েছে! নিউটন কুকুরটিকে একবারও মারতে উঠলেন না। একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না। কিন্তু এই আঘাত সহ্য করা তাঁর পক্ষে যে কত কঠিন ব্যাপার তা কয়েকদিন পর থেকেই টের পাওয়া যেতে লাগল। ধীরে ধীরে নিউটনের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল—এবং তাই ক্রমে তাঁকে টেনে নিয়ে চল্‌ল ভয়াবহ সংকটের মধ্যে। কি ছিল ঐ কাগজগুলির মধ্যে কে বলবে? হয়তো আরও বড় কোন আবিষ্কার—মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও বড় কোন আবিষ্কার,—যা প্রকাশ পেলে পৃথিবীর চেহারা একেবারে বদলে দিতে পারত—তাই সংগৃহীত ছিল ঐ কাগজে! নিউটন সে কথা কোন দিন কাউকে বলেন নি।

যাই হোক, বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায় উপযুক্ত চিকিৎসার পর ধীরে ধীরে নিউটন সেরে উঠলেন। মস্তিষ্ক আবার সুস্থ হ'ল, স্বাভাবিক হ'ল। ডাক্তাররা বললেন—নেহাৎই একটা সাময়িক ব্যাধি। হঠাৎ একটা দারুণ মানসিক আঘাতেই হয়তো ঐ রকম হয়েছিল।

এ ব্যাপারটা ঘটেছিল নিউটনের টাঁকশালে যোগ দেবার আগেই।

মস্তিষ্ক যে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল তার কয়েকটা প্রমাণও আছে।

এর বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন রয়্যাল সোসাইটির মুখপত্রে এক ঘোষণা বেরোল। ঘোষণা আর কিছু নয়—খুব কঠিন দু'টি অঙ্কের প্রশ্ন। ঘোষণা করেছেন বার্‌নলি নামে একজন

বিজ্ঞানী। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজকে উদ্দেশ করে চ্যালেঞ্জ করেছেন বার্‌নলি। কেউ পার তো এর সমাধান কর।

ঘোষণাটা নিউটনেরও চোখে পড়ল। নিজের নাম গোপন ক'রে পরদিনই তিনি ওর দু'টি সমাধান পাঠিয়ে দিলেন রয়্যাল সোসাইটিতে। নির্ভুল সমাধান। নাম দেওয়া না থাকলেও কে পাঠিয়েছে বুঝতে কষ্ট হ'ল না কারও। এত তাড়াতাড়ি এত দুরূহ প্রশ্নের জবাব আর কে দিতে পারে এক নিউটন ছাড়া?

ঠিক এই রকম আর একটি কঠিন প্রশ্নের সমাধান চেয়ে পাঠিয়েছিলেন জার্মানীর বিখ্যাত পণ্ডিত লাইব্‌নিৎস্‌ ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীদের কাছে। নিউটন তখন টাঁকশালের বড়কর্তা। সারাদিন কাজের পরে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরেছেন, এসেই শুনলেন প্রশ্নটির কথা— স্বয়ং লাইব্‌নিৎস্‌ যার প্রশ্নকর্তা। তখনই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে লাগলেন তিনি প্রশ্নটা নিয়ে। রাত্রে শুতে যাবার আগেই কাগজে তার নির্ভুল সমাধানটা টুকে রাখলেন নিউটন।

এ সব নিশ্চয়ই অসুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়।

এর পর নিউটনের ভাগ্যে পর পর আরও কয়েকটি সম্মান লাভ ঘটে। ১৬৯৯ সালে ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য হন তিনি— বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে যা পরম সম্মানের। ১৭০৩ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে সভাপতির পদে নির্বাচিত করে। সেই দিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, দীর্ঘ পঁচিশ বছর' তিনি বিজ্ঞানীর পরম আকাংক্ষিত এই সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সম্মানলাভের সঙ্গে তার উল্টোটাও যে হয় নি এমন নয়। এর বছর দুই পরে আবার তিনি কেম্‌ব্রিজ থেকে পার্লামেণ্টের সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। কেন যে দাঁড়ালেন, কি উদ্দেশ্যে যে

দাঁড়ালেন বলা কঠিন। অর্থ, প্রতিপত্তি বা সম্মান তিনি তখন এমনিতেই প্রচুর পেয়েছেন, পার্লামেণ্টের সদস্যের সম্মান যে তার চেয়ে কিছু বেশী এমন নয়। তা ছাড়া ও পদে তিনি আগেও এক সময়ে ছিলেন। রাজনীতিতে ঢুকে একটা নতুন কিছু করার অভিলাষ ছিল তাঁর এমন কথাও কেউ মনে করে না, কারণ এর আগেও পার্লামেণ্টে গিয়ে এই ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিককে কেউ মুখ খুলতে দেখে নি। তবে কিসের লোভে এই প্রচেষ্টা? ফল যা হবার তাই হ'ল। নিউটন নির্বাচনে হেরে গেলেন। রাজনীতিক হবার নেশাও সেই সঙ্গে তাঁর ছুটে গেল।

রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হলেও সেখানেও নিউটন খুব আরামে ছিলেন না। সে আমলে রয়্যাল সোসাইটির সদস্যেরাও বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে দলাদলির চর্চা করতেন প্রচুর। নিউটনও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, যার ফলে অনেক বড় বড় মনীষীর বন্ধুত্ব লাভের স্বযোগ পেয়েও তাঁকে হয়ে পড়তে হয় তাঁদের শত্রু। যে মূল্যবান্ সময় বিজ্ঞানের সাধনায় একনিষ্ঠ হয়ে দিতে পারলে তিনি পৃথিবীকে হয়তো আরও কত কিছু দিয়ে যেতে পারতেন, এই ভাবে তা অত্যন্ত বাজে কাজে তাঁকে নিয়োগ করতে হয়। বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে এটা একটা মস্ত আফশোষের কথা বৈ কি!

শেষের দিকে নিউটন ধর্মগ্রন্থ আর দর্শন নিয়ে লিখতে স্বরু করেন। বৈজ্ঞানিক হলেও কোন কালেই তিনি নাস্তিক ছিলেন না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বরাবরই গভীর আস্থা ছিল। তিনি যখন মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ—সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি ভাবে চলছে তারই তত্ত্ব প্রচার করেন তখন একদল অল্পশিক্ষিত লোক এই ব'লে আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করে যে নিউটন ঈশ্বরের মহিমা নষ্ট করবার মতলবে আছেন। নিউটন তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন যে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে

তিনি ঈশ্বরের মহিমা নষ্ট করছেন না মোটেই, বরঞ্চ ওর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার মহিমা আরও বেশী ক'রে প্রচার করছেন তিনি। এমন অদ্ভুত নিয়ম-শৃঙ্খলা যাঁর রাজ্যে তাঁর মহিমার কি তুলনা হয়?

নিউটনের ধর্ম আর দর্শনের বইগুলি কিন্তু তাই ব'লে তেমন উচ্চাঙ্গের হয় নি। বরঞ্চ, মনে হয়, তিনি ঐ সব নিয়ে সময় নষ্ট না ক'রে নিজের নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে থাকলেই ভাল করতেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক দানের তুলনায় ঐ সব দার্শনিক সাহিত্যের দাম কিছুই নয়।

বৈজ্ঞানিক নিউটন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া গেল, এবারে মানুষ নিউটন সম্বন্ধে একটু বললে তোমাদের বোধ হয় ভালই লাগবে।

নিউটন লোকটি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে। লম্বায় মাঝামাঝি আকারের, একটু মোটাসোটাই বলা যেতে পারে। মাথা ভর্তি একরাশ চুল। যদিও তখনকার দিনে পরচুলা পরার ফ্যাশনটা ওদেশে খুব বেশী ছিল, এবং নিউটনও তা পরতেন, তবুও তাঁর নিজের মাথার চুলও একটা দেখবার জিনিস ছিল। পরিণত বয়সে এই চুল হয়ে দাঁড়ায় তুষারশুভ্র। তখন সত্যি তাঁকে জ্ঞানবৃদ্ধ তপস্বীর মত দেখাত।

লেখাপড়ায়, অঙ্কে, বিজ্ঞানে ক্ষুরধার বুদ্ধি, যে কোন জটিল অঙ্ক মুহূর্তের মধ্যে ক'যে দেন, অথচ সাংসারিক জীবনে অত্যন্ত অন্যমনস্ক। পোশাক-আশাকে কোনও পারিপাট্য নেই। পায়ের মোজা, প্রায়ই দেখা যেত, গোড়ালির কাছে গিয়ে জড় হয়েছে। জামায়, প্যাণ্টে বোতাম লাগাতেই হয়তো ভুলে গেছেন। কখন কোথায় কি ধরনের পোশাক পরে যেতে হয়—কিসে সামাজিক ভদ্রতা রক্ষা হয় সে বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। ছেলেবেলা থেকেই এই রকম!

নিউটনের এই সব অন্যমনস্কতা নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা বানানো বলা মুশ্‌কিল। বড়লোকদের সকলের সম্বন্ধেই এ রকম গল্প কিছু কিছু রটে। তবে নিউটনের হালচালের কথা পড়লে মনে হয় এর সবগুলোই সত্যি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কয়েকটা গল্প বলি শোন ঃ

একবার, নিউটনের বয়স তখন বেশী নয়। গ্র্যাণ্টহাম সহরের কাছেই ছিল একটা পাহাড়—স্পিট্‌লগেট পাহাড়। এই পাহাড়ের

কথা আগেও বলেছি—যার তলায়, ঝোপের আড়ালে ব'সে, হাট-পালানো বালক নিউটন নানা রকম বই পড়তেন লুকিয়ে লুকিয়ে। নিউটন ঘোড়া নিয়ে পার হচ্ছিলেন পাহাড়টা। তখনকার দিনে তো ঘোড়াই ছিল চলাফেরার প্রধান অবলম্বন।

এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের ওপর ঘোড়ায় চড়ে চলা কষ্টকর, তাই নিউটন ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার লাগামটা ধ'রে হেঁটেই চলতে লাগলেন। ঘোড়াটা পেছন পেছন আসতে লাগল, লাগামটা রইল নিউটনের হাতে।

পাহাড় পার হয়ে সমতল পথে নেমে এলেন নিউটন। তখনও ঘোড়ার লাগাম তাঁর হাতে। ভাবলেন, এইবার ঘোড়ার পিঠে চড়া যেতে পারে। কিন্তু চড়তে গিয়েই—ও মা, কোথায় ঘোড়া! নিউটন দেখেন তাঁর হাতে শুধু লাগামটাই রয়েছে, ঘোড়া লাগাম থেকে বেরিয়ে কখন পালিয়ে গেছে নিউটন তা টেরও পান নি। অতখানি পথ তিনি শুধু লাগাম ধ'রে ধ'রেই এসেছেন। নিজের ভাবনায় এতই তন্ময়—এতই অন্যমনস্ক ছিলেন তিনি!

এই রকম আর একটা গল্প আছে।

নিউটন তাঁর এক বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছেন ডিনার খাওয়ার জন্য। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপর একদম ভুলে গেছেন সে কথা। ডিনারের সময়ে বন্ধু গিয়ে দেখেন নিউটন বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়ে গেছেন কেউ জানে না। টেবিলের ওপর তাঁর, অর্থাৎ নিউটনের, একার মত খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

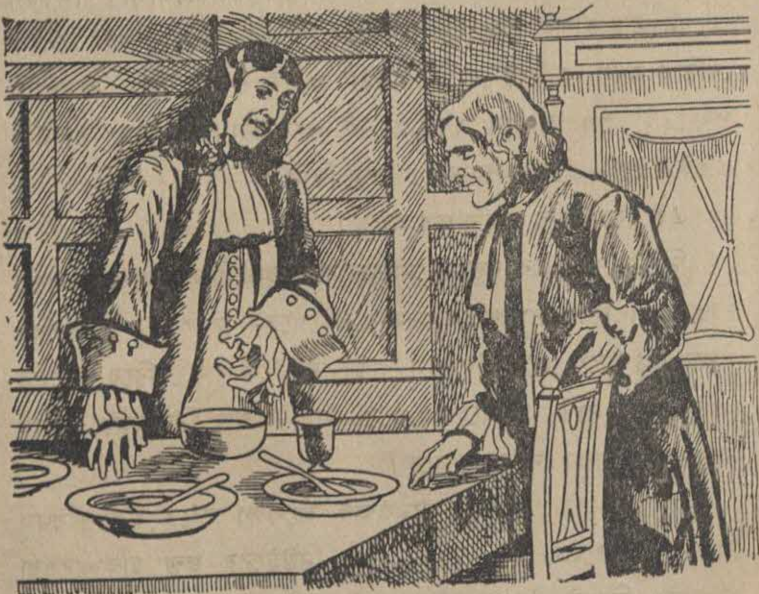
বন্ধু আর কি করেন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ক'রেও যখন নিউটন ফিরলেন না তখন উঠে নিউটনের জন্য ঢাকা-দেওয়া খাবারটা নিয়েই খেয়ে ফেললেন। বাড়ীতে বলা আছে যে আজ তিনি এখানেই খাবেন, তাই সেখানে খাবার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই নেই। তা ছাড়া খিদেটাও বেশ পেয়েছিল।

পরিপাটী করে খাওয়ার পর বন্ধুর মাথায় একটা খেয়াল এল—

এবারে একটু মজা করা যাক্। ভুক্তাবশিষ্ট মাংসের হাড়-টাড়গুলো ফের প্লেটে সাজিয়ে তিনি সেটা আবার তেমনি ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন টেবিলের ওপর।

একটু পরেই নিউটন বাড়ী ফিরলেন। বন্ধুকে দেখে ভারী খুশী। কিন্তু তাঁকে যে নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছে সে কথা আর মনে নেই। গল্প করতে করতে বললেন, "দাঁড়াও, খাওয়াটা শেষ করে নেই আগে। এতক্ষণে বোধ হয় সব জুড়িয়ে গেল।"

বন্ধু গম্ভীর হয়ে ব'সে রইলেন। ওদিকে নিউটন ঢাকনা খুলে দেখেন খাবার তো নেই—সব এঁটো হাড়গোড়ের টুকরো! লজ্জিত হয়ে উঠে পড়লেন তিনি ; বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, "দেখেছ কাণ্ড!



খেয়েছি, অথচ একদম তা ভুলে গেছি

স্মরণশক্তি আমার দিন দিন কেমন কমে যাচ্ছে! খেয়েছি, অথচ একদম তা ভুলে গেছি!"

নিউটন ভাবলেন, তিনিই হয়তো কখন অন্যমনস্ক ভাবে ও-খাবার খেয়েছেন। আর কেউ যে তাঁর সঙ্গে ও-রকম রসিকতা করতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

খাওয়াদাওয়া নিয়ে এই রকম গোলমাল তাঁর প্রায়ই হ'ত। খাওয়ার কথা প্রায়ই মনে থাকত না। অন্য কেউ এসে ডাকাডাকি করলে তখন খেয়াল হ'ত, তাই তো, খাওয়া হয় নি তো!

এই রকম অপরের বাড়ী নেমন্তন্ন থাকলেও মনে না করিয়ে দিলে তিনি প্রায়ই তা ভুলে যেতেন। তা ছাড়া বাইরে খেতে গেলে যে তার জন্য কেতাদস্তুর পোশাক প'রে যেতে হয়—ডিনার-স্যুট না প'রে যাওয়াটা যে 'এটিকেট'-বিরুদ্ধ সে কথাও তাঁর প্রায়ই মনে থাকত না।

নিউটনের সেই কুকুরছানার গল্প কে না জানে? ডায়মণ্ড কুকুরের কথা বলছি না, তাঁর আর একটি পোষা কুকুর ছিল—তার কথা বলছি। কুকুরটিকে রাখবার জন্য নিউটন একটা কাঠের বাক্স তৈরী করেছিলেন। বাক্সে ঢুকবার জন্য তার গায়ে একটা বড় গর্ত ক'রে দেওয়া হয়েছিল। কুকুরটা সেই পথে বাক্সের ভিতর যাওয়া-আসা করত। কিছুদিন পরে সেই কুকুরটির গোটা দুই বাচ্চা হ'ল। নিউটনের তখন মনে হ'ল, তাই তো, বাচ্চা দু'টো বাক্সে ঢুকবে কি ক'রে? তিনি বাক্সের গায়ে আর একটা ছোট ছেঁদা করে দিলেন—যাতে তার ভিতর দিয়ে বাচ্চা দু'টোও যেতে আসতে পারে। শুনতে ভারী আশ্চর্য লাগে, না? যে লোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এত অজানা রহস্য মানবসমাজের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন—এত অসম্ভব যাঁর বুদ্ধিবৃত্তি, তাঁর এটা খেয়াল হয় নি যে বড় গর্তটা দিয়ে বাচ্চা কুকুরগুলোও তো অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে,—তাদের জন্য আলাদা গর্তের কোনই প্রয়োজন নেই! আসলে এ হচ্ছে অন্যমনস্কতা। অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে যাঁদের ভাবতে হয়, তুচ্ছ ছোটখাট বিষয়ে তাঁরা অনেক সময় এই রকম হাস্যকর ব্যাপার

বাধিয়ে তোলেন। আমাদের দেশের মহাপণ্ডিত দার্শনিক ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্বন্ধেও এই ধরনের মজার মজার কত গল্প আছে।

নিউটন ছিলেন খুব স্বল্পভাষী পুরুষ। কথা খুব কম বলতেন, হৈ-হুল্লোড় তো একদমই পছন্দ করতেন না। অথচ এমন লোকও বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন—যেখানে বক্তৃতা দেওয়াটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় এবং হয়তো আসল কাজ!

পার্লামেন্টে গিয়ে নিউটন কি তা হ'লে বদলে গিয়েছিলেন? না, মোটেই না। তিনি হয়তো শুধু সভার কাণ্ডকারখানা দেখতেন, শুনতেন আর দল ভারী করতেন। পার্লামেন্টে গিয়ে কোন দিন তিনি মুখ খোলেন নি। লোকে ঠাট্টা করে বলত,—না, একদিন নিউটন মুখ খুলেছিলেন; দরওয়ানকে ডেকে নাকি একদিন বলেছিলেন, "ওহে, জানালাটা একটু ভাল করে খুলে দাও। ঘরে আলো আসুক।"

তবে কলেজে নিউটনকে অবশ্যই বক্তৃতা দিতে হ'ত। কারণ তিনি ছিলেন অধ্যাপক—বিখ্যাত লিউকেসিয়ান অধ্যাপক। কিন্তু সে তো তাঁর নিজের বিষয় নিয়ে বক্তৃতা! এই রকম, পঁচিশ বছর ধ'রে রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও কি তাঁকে কোন দিন বক্তৃতা দিতে হয় নি? —সভাপতির ভাষণ দিতে হয় নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। তবে সেখানেও ঐ এক কথা। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল তাঁর নিতান্ত আপনার জিনিস। তাঁর অতি প্রিয় বিজ্ঞান। সেখানে তাঁর মুখ হয়তো আপনিই খুলে যেত।

নিউটনের হাসিঠাট্টা নিয়েও অনেক গল্প আছে। তিনি নাকি কদাচিৎ হাসতেন। অট্টহাস্য—যাকে বলে প্রাণ খুলে হাসা—তা নাকি তাঁর জীবনে তেমন ঘটে নি! এ সম্পর্কেও লোকে ঠাট্টা ক'রে একটা গল্প রটিয়েছিল। গল্পটা হচ্ছে এই: নিউটন তাঁর এক বন্ধুকে একখানা বই পড়তে দেন। বলেন, "খুব চমৎকার বই,

প’ড়ে দেখ, তোমার খুব ভাল লাগবে।” বইখানা ছিল ইউক্লিডের একখানা জ্যামিতি।

বন্ধু বই নিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু দু’দিন বাদেই তা ফেরৎ দিয়ে গেলেন। নিউটন জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হে, কেমন লাগল বইটা ?”

বন্ধু জানালেন, বইটা তাঁর ভাল লাগে নি।

“বল কি হে! ইউক্লিডের জ্যামিতি ভাল লাগে নি?” অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে তুললেন নিউটন। এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কথা আর কি হতে পারে? সত্যি, এ একটা হাসির কথাই বটে। শুধু সেইদিনই নাকি প্রাণ খুলে হেসেছিলেন নিউটন,—যাকে বলে সত্যিকার অট্টহাসি।

এমন যে কাঠখোট্টা লোক, তার পক্ষে বিয়ে করা কি রকম কঠিন ব্যাপার তা আন্দাজ করা শক্ত নয়। বিশেষ ক’রে ইংল্যাণ্ডের মত দেশে, যেখানে বাপ-মা বিয়ে ঠিক করেন না,—বর-কনে নিজেরা পরস্পরকে বেছে নিয়ে বিয়ে করে এবং বিয়ের প্রস্তাবটা প্রায় সব ক্ষেত্রেই উত্থাপন করতে হয় বরকে।

নিউটন যখন গ্র্যাণ্টহামে মিঃ ক্লার্কের বাসায় থেকে পড়াশোনা করতেন তখন মিঃ ক্লার্কের স্ত্রীর আগের পক্ষের মেয়ে মিস্ স্টোরি ছিলেন তাঁর খেলার সাথী। দু’জনের মধ্যে তখন খুব ভাব হয়েছিল এবং শোনা যায় বড় হয়ে নিউটন তাঁকেই বিয়ে করবেন এই রকম একটা আভাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু বড় হয়ে নাকি সে প্রস্তাব করার সময় আর তাঁর হয়ে ওঠে নি!

এমনি ধারা তাঁর এক মামাতো বোনের সঙ্গেও তাঁর বিয়ে হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। নিউটনের বয়স তখন বছর তেইশ হবে। একদিন দু’জনে মিলে ব’সে গল্প করছেন। স্বল্পভাষী নিউটন অনর্গল ব’কে চলেছেন। শুনতে একটু অবাক্ লাগে, কিন্তু অবাক্ হবার কিছু নেই; কারণ নিউটনের বক্তব্য ছিল একটা জটিল বিজ্ঞান-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে। ঐ সম্পর্কে তাঁর নিজের কি মত তাই হয়তো

বোঝাচ্ছিলেন নিউটন মেয়েটিকে। মেয়েটি খুব মন দিয়ে শুনছিল, অর্থাৎ শোনার ভান করছিল। কেন-না কোন অল্প-বয়সী মেয়ে কেন, কোন প্রবীণ পণ্ডিত ব্যক্তিও ও-বিষয়ে কতটুকু বুঝতে পারতেন সন্দেহ। মেয়েটি হয়তো ভাবছিল—এইবার হয়তো নিউটন তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবেন। এইবার—এইবার—। কিন্তু ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে!

কু-লোকে বলে, নিউটন যদিও বিয়ের প্রস্তাব করবার মতলব নিয়েই মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে বসেছিলেন, কিন্তু, গল্পের বিষয়-বস্তু তাঁর মনের মত হয়ে যাওয়ায়, তাতে এতই তন্ময় হয়ে যান যে শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব করতেই ভুলে গিয়েছিলেন।

এ হেন লোকের কি কখনও বিয়ে হয়, না কি কোনও মেয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চায়?

নিউটন তাই আজীবন বিয়ে না ক'রেই কাটিয়ে দেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিউটনের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে আসছিল। তাঁর বয়স যখন আশী তখন তাঁর পাথুরে রোগ দেখা দিল। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এই রোগ। সারাজীবন তিনি বিয়ে করেন নি, বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে দেখাশোনার ভার নিলেন তাঁর ভাইঝি। এই ভাইঝিটিকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁর স্বামীও নিউটনের বিশেষ অনুগত ছিলেন।

শুধু পাথুরে রোগই নয়, সেই সঙ্গে নিঃশ্বাসের কষ্টও ছিল। ফুস-ফুসে কেমন একটা জ্বালা! কিছুই ভাল লাগে না। তার ওপর আবার সুরু হ'ল বাতের আক্রমণ—গাউট। আরও ভেঙ্গে পড়লেন নিউটন।

সহরের ধুলো আর ধোঁয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয় বিবেচনা ক'রে তাঁকে কাছাকাছি এক গ্রামে রাখবার ব্যবস্থা করা হ'ল। কিন্তু নিউটন কি গ্রামে থাকবার লোক? একটু সুস্থ হ'লেই লণ্ডনে চ'লে আসেন। বলেন, "আমি গ্রামে গিয়ে বসে থাকলে রয়্যাল সোসাইটির কাজ দেখাশোনা করবে কে?"

এই রয়্যাল সোসাইটিই শেষে তাঁর কাল হ'ল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী। শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হওয়ায় ঐ তারিখে তিনি আবার চ'লে এলেন লণ্ডনে,—রয়্যাল সোসাইটির এক সভায় সভাপতিত্ব করতে। ৪ঠা মার্চ আবার ফিরে এলেন গ্রামে। কিন্তু তখন তিনি ভীষণ অসুস্থ।

দারুণ রোগযন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আরও বারো-তেরো দিন কেটে গেল। এই সময়ে তাঁর বন্ধুরা প্রায়ই তাঁকে দেখতে আসতেন। কে জানে, হয়তো এই সময়েই তিনি সেই বিখ্যাত কথাগুলি তাঁর কোন বন্ধুকে বলে থাকবেন।—"আমি আর কি করেছি? ছোট ছোট ছেলেরা যেমন সাগরতীরে নুড়ি আর ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়ায় আমিও তেমনি নুড়ি আর ঝিনুকই কুড়িয়ে গেছি। হয়তো তারই মধ্যে কখনো-সখনো এমন এক-একটা নুড়ি পেয়েছি যা

অন্যান্য নুড়ির তুলনায় একটু বেশী মসৃণ কিংবা এমন এক-একটা ঝিনুক পেয়েছি যা অন্যান্য ঝিনুকের চেয়ে একটু বেশী সুন্দর। কিন্তু ঐ



আমি আর কি করেছি? ছোট ছোট ছেলেরা যেমন সাগরতীরে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ায় আমিও তেমনি·· ···

পর্যন্ত। অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র আমার সামনে দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে গেছে। কোন নাগালই তার পাই নি আমি।"

১৮ই মার্চ, ১৭২৭। সকাল বেলা উঠে নিউটন দৈনিক খবরের কাগজখানি প'ড়ে নিলেন। এর ওর সঙ্গে দু'-চারটে গল্পও করলেন। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ঘুম আর তাঁর ভাঙ্গল না।

ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবির বিখ্যাত প্রাঙ্গণে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের পাশে এই মহাবিজ্ঞানীকেও এনে শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

মৃত্যু এসে নিউটনের নশ্বর দেহকে গ্রাস করল কিন্তু বিশ্ববাসীর অন্তরে চিরকালের জন্য বেঁচে রইলেন তিনি।

—শেষ—

বিজ্ঞান-সাধক চরিতম

॥ এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য ॥

যুগে যুগে কত মনীষী কত সাধনায় তাঁদের জীবন অতি
করে গেছেন। কেউ করেছেন সাহিত্য-সাধনা, কেউ করেছে
সাধনা, আবার কেউ বা করেছেন বিজ্ঞান-সাধনা।

আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের যে কত প্রয়োজন, একথ
আর কারো অজানা নেই। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ভূমিকার কথা
ছোটদেরও কিছু-কিছু জানা আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে
সাধকদের পরিচয় জানে ক'জনা? সেই বিশেষ অভাবটি দূরী
জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা—"বিজ্ঞান-সাধক চরিতমালা"।

● ● ● ●

ছোটদের কাছে রহস্য আর রোমাঞ্চকর কাহিনী চিরকালই
কিন্তু সে কাহিনী মন-গড়া না হয়ে সত্যিকার কাহিনীও
পারে! এই রকম অনেক কাহিনী আমাদের চোখের
ছড়িয়ে আছে, আর তার সন্ধান দিয়েছে বিজ্ঞান। মন-গ
চাইতে বিজ্ঞানের এই সব সত্যিকার গল্প কম কৌতূহল
কিন্তু বিজ্ঞানীকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের গল্প হয় না; আবিষ্ক
আবিষ্কারকের কাহিনী তাই পাশাপাশি থাকা দরকার।

বিজ্ঞান স্বভাবতঃই একটু জটিল। ছোটদের কাছে ঠি
কতটুকু পরিবেশন করা চলে—ঠিক কতটুকু পর্যন্ত তারা বুঝে উপ
করতে পারবে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। দুরূহ, দু
জিনিস তাদের সামনে এনে লাভ নেই। এই জন্যই এই পুস্তকম
বই-এ, কোন কোন আবিষ্কারের কথা মাত্রা না ছাড়িয়ে সংক্ষে
বলতে হয়েছে।